জেলজীবনের আলপনা

শাইখ আবু হুজাইফা আস-সুদানী হাফিজাহুল্লাহ

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

জেলজীবনের আলপনা

শাইখ আবু হুজাইফা আস-সুদানী হাফিজাহুল্লাহ

জেলজীবনের আলপনা
শাইখ আবু হুজাইফা আস-সুদানী হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ
মারওয়ান হাদীদ

সম্পাদনা
ইলয়াস আমিন

গ্রন্থস্বত্ব © আমজাদ পাবলিকেশন্স

প্রকাশক
আহমাদ ফরিদ

প্রথম প্রকাশ
জামাদিউল উলা ১৪৩৯ / ফেব্রুয়ারী ২০১৮

অলংকরণ
আহমাদ আব্দুল্লাহ

মূল্য: ১৮০ টাকা
আল-ফিরদাউস মিডিয়া

«إِنَّ عِظَمَ الجَـزَاءِ مَـعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًـا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِـيَ فَلَـهُ الرِّضَـا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ»

‘নিশ্চয়ই বিপদ বাড়ার সাথে সাথে প্রতিদানও বৃদ্ধি পায়, আর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন; তখন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি পরীক্ষার এ কঠিন মুহূর্তেও সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাআলাও তার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ তাআলাও তার ওপর অসন্তুষ্ট হন।’

-সুনানে তিরমিযী : ৬০১

প্রকাশকের কথা
কারাগারের অভ্যন্তরেও অনেক বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যার গুরুত্ব সরাসরি শত্রুদের সাথে উম্মাহর লড়াই থেকে কোনো অংশে কম নয়। বিভিন্ন ময়দানে যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার ভয়াবহতা থেকে কোনো অংশে কম নয় কারাগারের এ যুদ্ধের ভয়াবহতা। এটা হচ্ছে অস্তিত্ব রক্ষা ও বেঁচে থাকার লড়াই। চড়া মূল্যের বিনিময়ে উন্নত বিশ্বাস এবং নৈতিক বিজয় অর্জনের লড়াই। এটি এমন এক লড়াই, যাতে পাশবিকতা ও জুলুমের মাত্রা সীমালঙ্ঘন করে; সাহসী বন্দী মুসলিম সৈনিকদের দৃঢ়তা ও অটলতা থেকে সরিয়ে তাঁদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা চলে। কিন্তু তাঁদের কাছে সেই নির্মম পাশবিকতাকে মনের গভীরে প্রোথিত ঈমানের দীপ্ত শিখার সামনে অতি সামান্যই মনে হয়। যে শিখা জ্বলে উঠেছিল কুরআনের সাহায্যে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকনির্দেশনায়। তাই তো এসব সোনার মানুষকে মৃত্যু কিংবা শাস্তির ভয় মোটেও ভাবিয়ে তোলে না। জীবনের কঠিনতম মুহূর্তগুলো তাঁদের কাছে মনে হয় বিপদের মাধ্যমে নেকির পাল্লা ভারী করার অনন্য সোপান। সুতরাং কে তাঁদের পরাজিত করতে সক্ষম? বিপদ যাঁদের দৃঢ়তা, আত্মমর্যাদা

ও আশাবাদ বাড়িয়ে দেয় শতগুণে। কারাগারের নিপীড়ন-নির্যাতন যাঁদেরকে আসমানের সিড়ি বেয়ে ওপরে ওঠতে সহায়তা করে। আসমান-জমিনের পালনকর্তার নিকটতম হওয়ার সুযোগ করে দেয়। কেবা তাঁদের বিজয় ঠেকায়?!

এ গ্রন্থ প্রজ্ঞা ও ভালোবাসার স্পন্দন সৃষ্টি করবে হৃদয়জুড়ে। কালোরঙা জ্বলজ্বলে হরফগুলি আলো ছড়াবে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, বাস্তব অনুভূতি ও সত্য কিছু অনুভবের চিত্রাবলির। যা আমাদের জন্য স্বীয় নিপুণ তুলির আঁচড়ে এঁকে দিয়েছেন শাইখ আবু হুজাইফা আস-সুদানী হাফিজাহুল্লাহ (কারাগারে আল্লাহ তাঁর সংগ্রামকে কবুল করুন)। তাগুতের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আগুনের কারাগারে বসে তিনি ভগ্নহৃদয়ের আবেগ ও মাধুরী মিশিয়ে আমাদের জন্য এক অনুপম স্টাইলে উপস্থাপন করেছেন সেসব অভিজ্ঞতা। হৃদয়-আঁচড়ে এঁকেছেন এসব আলপনা। তিনি আমাদেরকে নিজেদেরকে অবিচলতার কিংবদন্তি হিসেবে প্রমাণ করেছেন। আসুন, আমরা জেনে নেই কী তাঁদের গল্প? কী সেই জেলজীবনের আলপনা?....

সূচিপত্র

ভূমিকা..7 মুমিনের বন্দীদশা......................................9 তারবিয়াত..12 হিফজুল কুরআন..14 ইলমের সাগরে অবগাহন.................................16 ইবাদতে মনোনিবেশ......................................18 জুলুমের জাঁতাকলে....................................21 নিজেকে প্রস্তুত করার যত আয়োজন..............24 কালোজাদুর কবলে..26 যোগাযোগের চেইন..28 জিজ্ঞাসাবাদকারীর সাথে...........................31 কক্ষ নং - ১১৬..33 ভ্রাতৃত্ববোধ...35 আশাবাদী মনের আলপনা.................................38 হৃদয়ে খোরাসান..39 প্রিয় শাইখের সাহচর্য.............................41 বিষণ্ণতার গল্প..43 সত্যপথের সিংহরা......................................45 রণাঙ্গনের আলপনা......................................46 জান্নাতী এক ভাইয়ের সাথে.........................47

[7]

ভালোবাসার পঙক্তিমালা............................49 শাহাদাতের পূর্বে এক শহীদের সাথে..........50 অভ্রলেহী আলোর মিনার...............................52 দরদমাখা কিছু কথা.....................................53 অনুপম চরিত্র ছিল তাঁর............................54 শেষ চিঠি...56 এক শহীদের কবরে...57

ভূমিকা

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم أما بعد

‘জেলজীবনের আলপনা’- এ কোনো কল্পিত কাহিনী নয় , নয় রূপকথার গল্প। এ হচ্ছে একজন মাজলুম বন্দীর অভিজ্ঞতার অম্লমধুর সার - নির্যাস। যিনি ধৈর্য ও পরীক্ষার কত অমসৃণ প্রান্তরে তৃষ্ণার্ত চষে বেড়িয়েছেন ; যা তাঁর ভাষায় এনে দিয়েছে অনুপম বুনন। তাঁর এ লেখনীর মাধ্যমে কখনো আমরা কারাগারের রীতিনীতির সাথে পরিচিত হই আবার কখনো বন্দী ভাইদের চারিত্রিক গুণাবলিতে মুগ্ধ হই। কখনো তিনি আমাদের নিয়ে ওড়াল দেন কর্তৃপক্ষের শত ষড়যন্ত্র সত্তেও ভাইদের আত্মত্যাগ , সংঘবদ্ধতা ও ধৈর্যের অন্য এক ভুবনে। সত্যিই শিক্ষনীয় প্রতিটি কথা। যা আমাদের চলার পথে অনেক অনেক সাহস জোগাবে।

এর প্রত্যেকটি বর্ণ লিখেছেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এমন এক প্রাজ্ঞ বন্দী ; যাঁর প্রত্যেকটি অনুভব , প্রত্যেকটি আলপনা আমাদের জাগিয়ে তোলে- বিপদে নিপতিত মুসলিম বন্দী ভাইদের আত্মিক সৌন্দর্যের আলোকচ্ছটায়। এসব সোনার মানুষের অপ্রতুল আলোচনার পরিণাম আমাদেরকে ভোগায়। তাঁদেরকে কারাগারের প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে আনতে আমাদেরকে উৎসাহ জোগায়। তাঁদের

মাঝে আছেন ইলমের বিশাল সাগর; যাঁরা দিনরাত কারাগারের ছোট্ট প্রকোষ্ঠে বিচরণ করেন। তাঁদের রণচাকা ঘুরছে তো ঘুরছেই! কারাগারের বাতাসে প্রতিদিন তাঁদের বিজয় হাসে। অবিচলতা, ধৈর্য ও আল্লাহর স্মরণের মাঝে। কিতাবুল্লাহ’র মুখস্তকরণ, ইসলামী জ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা এবং খেদমত-ভ্রাতৃত্বের মধুর প্রতিযোগিতায়। চরম বিরক্তির মুহূর্তের মুচকি হাসিতে। যা জালিমের ক্রোধকে সমূলে বিনাশ করে। যে ব্যক্তি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে করে পড়বে, তার জন্য এ গ্রন্থে রয়েছে যত উন্নত সব অভিজ্ঞতা।

আল্লাহ শাইখ আবু হুজাইফা আস-সুদানী হাফিজাহুল্লাহকে সর্বোত্তম বিনিময় দিন। তাঁর এসব মহামূল্যবান আলপনা ও সুকঠিন ইতিহাস শেয়ার করে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। আশা করি, প্রত্যেক আত্মোৎসর্গকারী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভাইগণ শাইখের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। তবেই আমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় পরস্পর সহযোগিতা করতে পারব, সত্য ও ধৈর্যের ওপর গুরুত্বারোপ করতে পারব। আমজাদ পাবলিকেশন্স এই মুক্তদানা কুড়িয়ে নিতে দেরি করেনি। দুই মলাটে এসব আলপনা একত্রিত করতে ভুল করেনি। এ গ্রন্থ নিশ্চয় ইসলামী ও জিহাদী প্রকাশনাজগতে আলো ছড়াবে। আমরা তা থেকে শিখতে পারব শাইখের হৃদয়ের দরদ ও শব্দের গাঁথুনি-

কারিশমা। কীভাবে এসব মানুষ বিপদের কঠিন ঝুপড়িকে ইলম ও হিদায়াতের মিম্বারে পরিণত করতে পারেন?

মুমিনের বন্দীদশা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ

‘তোমাদের ওপর কিতালকে ফরয করা হয়েছে ; যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। ’

‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ’র পথ অনেক কঠিন, তার সফর অনেক কষ্টকর এবং তার চাপ অনেক তীব্র ; কিন্তু তার আঞ্জাম অনেক মধুর। ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ’ হলো-ত্যাগ ও কুরবানির পথ। ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ’ মানে হলো-মাতাপিতা , স্ত্রী সন্তান -সন্তুতি এবং নিজ আবাস পরিত্যাগ করা। জিহাদ মানে হলো -নিরাপত্তাঝুঁকি এবং বন্দিত্ব। আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়াই হলো মুজাহিদদের পরম চাওয়া।

মুজাহিদগণ সব সময় টেনশনে থাকেন যে , কখন এসে আপতিত হয় বন্দিত্বের এ বিপদ। জিহাদ করতে গিয়ে একজন মুজাহিদের জন্য এটিই সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়। এর কাছে জিহাদের অন্যান্য কষ্টকর মুহূর্তগুলো হার মানে। কিন্তু আমরা পছন্দ করি আর না করি, মুজাহিদকে অবশ্যই জানতে হবে , এ বন্দিত্ব তাঁর সম্ভাব্য বিপদ ও কষ্টকর মুহূর্তগুলির অন্যতম। তাঁর ধারণায় এটা রাখতে হবে যে , সে যেকোনো সময় এ অভিজ্ঞতার

সম্মুখীন হতে পারে , এই কষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হতে পারে।

সতর্কতাই উত্তম প্রতিকার। এজন্য মুজাহিদকে বন্দিত্ব এড়ানোর কৌশল ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। সবচেয়ে বড় কৌশল ও অবলম্বন হলো - একমাত্র আল্লাহর ওপরই পরিপূর্ণ আস্থা রাখা , তাঁর প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করা এবং ‘একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট ’ এ কথার ওপর পূর্ণ একীন রাখা। সত্যিকার অর্থে আল্লাহর বান্দা হতে পারলে এ ধরনের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জিত হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন -

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ

‘আল্লাহই কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?’

যে যতটুকু আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দা হতে পারবে , আল্লাহ সে পরিমাণেই তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামি যতই বৃদ্ধি পাবে , আল্লাহ ততই তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন। যেমনটি আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন। আল্লাহর নিকট খুব দুআ ও কান্নাকাটি করতে হবে। তারপর মুজাহিদ তাঁর ব্যক্তিগত ও দলগত নিরাপত্তা লাভ করতে সক্ষম হবে। তবেই সে কখনো বন্দী হলে উদ্ভূত পরিস্থিতির শান্তভাবে মোকাবেলা করতে পারবে।

জেলখানায় কয়েকজন বন্দী ভাইদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা কি বন্দী হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন? তাদের অনেকেই না-বাচক উত্তর দিয়েছিলেন। এদের কাছে বন্দিত্ব একটি আকস্মিক ধাক্কা ছিল। শুরু শুরু তারা অনেক কঠিন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাদের এই কষ্টকর অভিজ্ঞতাকে নির্ঘাত ‘ওজন কমানোর ফেজ’ বলা যেতে পারে। তবে আল্লাহ তাদের প্রতি খুব দ্রুত সদয় হয়েছেন। তারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেননি। প্রাথমিক ধাক্কা সামাল দিয়ে তারা মানসিকভাবে স্থির হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৪২২ হিজরীতে আমরা কাসিম থেকে রিয়াদ ফিরছিলাম। আমরা চারজন ছিলাম। সবাই ছিলাম একই সেলের সদস্য। আমাদের মধ্য থেকে একজন আমাদের ভবিষ্যতের সামরিক অপারেশন এবং বন্দিত্ববরণসহ অন্যান্য কষ্টকর মুহূর্তগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। তাঁর এ কথা পরবর্তী সময়ে অনেক কাজে এসেছিল।

আমরা চারজনই একসাথে বন্দী হয়েছিলাম। প্রথমজন ৫ বছরের কারাদণ্ড পেয়ে ১১ বছর পর মুক্তি পেয়েছেন। দ্বিতীয়জন ১৫ বছরের পরিপূর্ণ সাজা ভোগ করে মুক্তি পেয়েছেন। তৃতীয়জন ১২ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে এবং চতুর্থজন ১৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হয়ে ১৬ বছর ধরে কারাভোগ করছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে

মুক্তি দান করুন এবং সকল বন্দীদের কষ্ট দূরীভূত করে দিন।
জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন-
‘মুমিন বান্দা আল্লাহর পথে জিহাদ করে।
যদি সে তাতে ব্যর্থ হয়, তখন সেখানেও তার লাভ থাকে।
আর যদি সে কষ্ট ভোগ করে, তখন সেটা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়।
আর যদি সে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়, তখন সেটা হয় তার নতুন পথের সন্ধান।
আর যদি সে বন্দী হয়, তখন এটা হয় তার জন্য ইবাদত।
আর যদি সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে, তখন সে নেতৃত্ব অর্জন করে।
আর যদি মৃত্যুবরণ করে, তখন হয় সে শহীদ। সর্বোপরি, তার জন্য রয়েছে অনেক অনেক কল্যাণ ও উপকার।’

তারবিয়াত
জিজ্ঞাসাবাদের সময়টা জেলে কাটানো সময়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন সময়। শারীরিক ও মানসিক কষ্টের যেসব স্তর একজন বন্দীকে পার করতে হয়, তার সবচেয়ে কঠিন স্তর হলো এই জিজ্ঞাসাবাদ। এশার নামাজের পর থেকে ফজরের আজান পর্যন্ত কখনো কখনো সকাল আটটার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত) দীর্ঘ সময়ব্যাপী চলা এ জিজ্ঞাসাবাদের প্রাথমিক পর্ব শেষ হওয়ার পর একক সেলে আমার প্রাথমিক দিনসমূহে আল্লাহ তাআলা লাইব্রেরিয়ানকে আমার অনুগত করে দেন। তখন আমি তার কাছ থেকে তাফসীরে ইবনে কাসীরের প্রথম খণ্ড ফাতহুল বারীর কিতাবুল জিহাদ, যাদুল মাআদের তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ কিতাবুল জিহাদ, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমের তাহযীবু মাদারিজুস সালিকীন- এ চারটি কিতাব চাইলাম। সে কিতাবগুলো নিয়ে এল কিতাবগুলো হাতে পাওয়া আমার প্রতি আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত ও অনুগ্রহ ছিল। বিশেষ করে তাহযীবুল মাদারিজ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পেশাল অনুগ্রহ আমার দুর্বল ব্যক্তিত্বের আল্লাহপ্রদত্ত সঞ্জীবনী শক্তি। জেলের এ ছোট ঘরে এ ধরনের একটা কিতাবের আমার খুব প্রয়োজন ছিল। আমি হৃদয়ের সবটুকু আবেগ-অনুভূতি নিয়ে কিতাবটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিচরণ করেছি।

তার প্রতিটি লাইনকে আমি অন্তরের চোখ দিয়ে পড়েছি। তার প্রতিটা শব্দ আমার সত্তাকে আন্দোলিত করেছে। তার কথা আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রবাহিত হলো। কী চমৎকার ছিল সে মুহূ্তগুলি! সে অনুভূতি ব্যক্ত করার মতো নয়। কারাপ্রকোষ্ঠে আমি কিতাবটির দুই মলাটের মাঝে আবদ্ধ ছিলাম। এটি আমার ব্যক্তিসত্তায় চরম দাগ কাটে। যেন কিতাবটি আমার ব্যক্তি-মানচিত্রকে নতুনভাবে অঙ্কিত করেছে। মূলত আমি বিক্ষিপ্ত পত্রপল্লবের ন্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলাম। এ কিতাব এসে আমাকে পরিমার্জিত ও সুসংগঠিত করেছে।

যখন তাওয়াক্কুলের স্তর, সবর, রিযা (সন্তুষ্টি), শুকর ইত্যাদি অধ্যায়গুলো পড়ছিলাম, তখন কিতাবটির বিশেষ তত্ত্বাবধানে ছিলাম আমি। আমার অন্তর এবং আমার পুরো জীবনজুড়ে নীরব একটা প্রভাব সৃষ্টি করেছে এ কিতাব। জেলের পুরো সময়জুড়ে এর প্রভাব আমার ওপর ছিল। এর কারণে আমার চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। এটার মাধ্যমে আমি বুঝতে শিখেছি যে, বিপদাপদ আসলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত; শাস্তি বা ক্রোধ নয়। কষ্ট-দুর্ভোগ আসলে তা আল্লাহর তরফ থেকে অনুদান। ব্যথা-বেদনা আশাপূরণের আগমনী বার্তা দেয়। আল্লাহর রাস্তায় আসা সকল মুসীবত থেকে রূহ স্বাদ আস্বাদন করে থাকে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, নিজ সত্তার পরিচর্যা ও পরিশুদ্ধি ঘটানোর জন্য জেলজীবন বড় এক সুযোগ। এখানে হৃদয় পরিপূর্ণ উন্মুক্ত ও উদ্ভাসিত হয়। এখানে এসে তুমি নিজের শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। তারপর আল্লাহর সাহায্য নিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত ও শিষ্ট-সভ্য করে গড়ে তুলতে পারবে এবং নিজের ভুলভ্রান্তি ও স্খলন সংশোধন করতে পারবে।

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ হলেন তারবিয়াতের উস্তাদ। তাঁর কিতাবে তিনি বলেছেন, নিজেকে আধ্যাত্মিক সাজে সজ্জিত ও বিন্যাস করতে চেষ্টা কর; তাহলে জেলের প্রতিটা ঘটনা তোমার জন্য তারবিয়াতী সবক হবে। প্রতিটা মুহূর্ত তোমার জন্য বাস্তব ও উপকারী অভিজ্ঞতা হবে। প্রতিটা বিষয় তোমার জন্য আধ্যাত্মিক উপকার বয়ে আনবে। আসল তারবিয়াত তো জেলের প্রতিদিনের ঘটনাবলি থেকে লাভ করা যায়।

জেলকে যদি আমি ‘তারবিয়াত-ইনকিউবেটর’ বলি, যেখানে তোমার সত্তাকে নতুনভাবে নির্মাণ ও গঠন করা হবে; যার অ্যাসিডে প্রবৃত্তির সকল ধুলো-ময়লার আবরণ গলে গিয়ে নফস বা প্রবৃত্তি পরিষ্কার-পরিশুদ্ধ হবে, তুমি হক্ব-বাতিলের লড়াইয়ের স্বরূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে এবং ইস্পাত-কঠিন মনোবল, পাহাড়সম দৃঢ়তা ও আমৃত্যু অটলতা নিয়ে

আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে পবিত্র কাফেলার সাথে পবিত্রতম গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে, তাহলে তা মোটেই অত্যুক্তি হবেনা।

হিফজুল কুরআন
বন্দী তার জেলজীবনের প্রাথমিক সময়গুলো পবিত্র কুরআনের প্রতি মনোযোগ দিয়ে শুরু করে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে কুরআন হিফজ করা এবং এ নিয়ে ব্যস্ত থাকার পথ সুগম করে দেন। কুরআন মুখস্থ করাই তখন তার একমাত্র কাজ এবং ব্যস্ততা হয়ে দাঁড়ায়। শয়নে- স্বপনে বল আর পানাহারের সময় বল, তার শুধু একটাই চিন্তা থাকে, তা হলো- নির্ধারিত পরিমাণ কুরআন মুখস্থ করে নেওয়া। এভাবে সে জেলের সকল পেরেশানিকে ভুলে যায়। কুরআন মুখস্থ করার সামনে অন্য সকল চিন্তা- ফিকির একদম ‘নেই’ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর তরফ থেকে বড় নেয়ামত ও মেহেরবানি।

বন্দী ব্যক্তি হিফজের মাঝে একদম আত্মহারা হয়ে যায়। যতই হিফজ করতে থাকুক, তার তৃপ্তি আসে না, আবার বিরক্তিবোধও করে না। শুরুতে প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করে মুখস্থ করে। তারপর আরও বেশি করে মুখস্থ করতে শুরু করে। আমার পরিচিত একজন প্রতিদিন আড়াই পৃষ্ঠা করে মুখস্থ করতেন। এমন একজনকেও আমি জানি, যিনি প্রতিদিন আধা পারা মুখস্থ করতেন। অর্থাৎ প্রতি দু’দিনে তাঁর এক পারা মুখস্থ হয়ে যেত।

আল্লাহর রহমতে জেলজীবনের প্রাথমিক দিনগুলোতে আমিও হিফজের যাত্রা শুরু করি। একক সেল থেকে যখন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাকে বের করা হয়, তখন আমি সূরা বাকারা থেকে সূরা মায়েদা পর্যন্ত মুখস্থ করে ফেলি। মজার বিষয় হলো জিজ্ঞাসাকারী বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, হিফজ কতটুকু পৌঁছেছে। একক সেল থেকে সাধারণ কারাকক্ষে আসার পর হিফজের যাত্রাকে পরিপূর্ণ করি। আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ ও দয়ায় বন্দী হওয়ার দশম মাসের মধ্যেই আমি হিফজে কালামুল্লাহ সম্পন্ন করি।

কুরআনের শেষ আয়াতটি মুখস্থ করার পর আমার ভিতর আনন্দ ও সৌভাগ্য-মিশ্রিত অদ্ভুত এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আমার শিরা-উপশিরায় এক ধরনের অদ্ভুত শিহরণ খেলে যায়। এ অনুভূতি বোঝানোর ভাষা আমার নেই। সাথে সাথে আমি আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে সিজদায় লুটিয়ে পড়ি।

১১ রবিউল আউয়াল ১৪২৪ হিজরী এর অপারেশনের পূর্বে জেলখানার কক্ষগুলো প্রায় খালি ছিল৷ একটি কক্ষে আমি এবং আমার এক সাথি থাকতাম। আমরা ছাড়া এ কক্ষে আর কেউ ছিল না। তিনিও আমার মতো কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করেছিলেন। হিফজকে পাকাপোক্ত করার জন্য আমরা একটি ফলদায়ক প্রোগ্রাম হাতে নিই। তা হলো, আমরা প্রতিদিন নির্ধারিত একটা অংশ পুনরায় মুখস্থ করতাম। এছাড়া আমরা

সপ্তাহব্যাপী প্রতিদিন নির্দিষ্ট দু’পারা একে অপরকে শোনাতাম। আরেক সপ্তাহ শুরু হলে ঐ সপ্তাহের জন্য পরবর্তী দু’পারা নিতাম। এভাবে প্রতি সপ্তাহের জন্য দু’পারা করে ভাগ করে ঐ দু’পারা সপ্তাহের প্রতিদিন একে অপরকে শোনাতাম। এভাবে কুরআন খতম (পুরো ৩০ পারা তিলাওয়াত সম্পন্ন) হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলত আমাদের প্রোগ্রাম। আসরের পর বসে একজন প্রথম রুবু’ (এক চতুর্থাংশ) শোনাতাম। তারপর দ্বিতীয়জন পরবর্তী রুবু’ শোনাতাম। এভাবে দু’পারা শেষ করতাম। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করতাম। তবে এবার পালা পরিবর্তন করে নিতাম। অর্থাৎ প্রথম পর্বে যদি আমার সাথি শুরু করতেন; তাহলে শেষের পর্বে আমি আগে পড়তাম। আমাদের কুরআন খতমের এ পদ্ধতি প্রায় ৪ মাসব্যাপী ছিল।

কুরআন হিফজ করার প্রতি বন্দীদের আশ্চর্যজনক আগ্রহের কারণে অনেক কুরআন প্রেমিকের উপকার হয়েছে। অবশ্য মাঝে মধ্যে কারাগারের বিশেষ কিছু প্রকোষ্ঠে কুরআন হিফজ করার সুযোগ থাকে না। তবে এ ধরনের পরিস্থিতি খুব কম সময়েই আসে। অধিকাংশ বন্দী কুরআন হিফজ করার এ নেয়ামত অর্জন করেছেন। কারাগারে কুরআন হিফজ করাটা স্বাভাবিক কাজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য বন্দীদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ

হলে কুরআন হিফজ করেছ কিনা, জিজ্ঞাসা করতাম না। কারণ, হিফজ করাটাই স্বাভাবিক বিষয় ছিল। হিফজ করেনি এমন বন্দী পাওয়াটাই বরং আশ্চর্যের ছিল।

নিঃসন্দেহে কারাবন্দী মুজাহিদ বান্দাগণের প্রতি এটা আল্লাহর বিশেষ একটি রহমত। একটি গুণগত পরিবর্তন। ‘ইদাদে শরয়ী’র প্রথম পদক্ষেপ।

ইলমের সাগরে অবগাহন

কারাগারে আল্লাহর অন্যতম বড়
নেয়ামত হচ্ছে তোমার সাথে এক কক্ষে একজন তালিবে ইলম থাকা। তখন জেলের সময়টা ইলম, উপদেশ এবং সঠিক দিকনির্দেশনার সাথে কাটে। অবশ্য এ ধরনের সুবিধা দীর্ঘ সময় ধরে খুব একটা থাকে না।

অধিকাংশ বন্দী হিফজ শেষ করার পর ইলম শেখার প্রতি আগ্রহী হয়। আমাদের কিছু ভাই জেলে ‘আল-জামউ বাইনাস-সাহীহাইনি ওয়ায যাওয়ায়িদ’ কিতাবটি মুখস্থ করা শুরু করেন। তাঁরা বিরামহীন মেহনত শুরু করেন। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজন প্রতিদিন দশ পৃষ্ঠা করে মুখস্থ করতেন। আবার কেউ কেউ দিনে আঠারো পৃষ্ঠা করে মুখস্থ করতেন। এভাবে মুখস্থ করার ক্ষেত্রে কেউ পিছিয়ে আবার কেউ এগিয়ে ছিলেন। তবে সবাই নিজ নিজ হিফজের গতি অনুযায়ী দুই থেকে ছয় মাসের মধ্যে পুরো কিতাব মুখস্থ করে নেন। একবার খতম করার পর আবার, তারপর আবার, তারপর আবার। এভাবে তাঁরা হিফজকে একদম পাকাপোক্ত করে নেন।

এখানে বন্দীদের আরেকটি দল ‘মুতূনে ইলমিয়্যাহ’ মুখস্থ করার প্রতি মনোযোগী হয়। তাঁরা আমাদের সাথে বন্দী হওয়া কিছু তালিবে ইলম ভাই কর্তৃক প্রবর্তিত ইলমী

প্রোগ্রামের আদলে মেহনত শুরু করে। আমার মনে আছে, সেখানে শায়খ নাছির আল-ফাহাদ (আল্লাহ তাঁর মুক্তি তরান্বিত করুন)-কে কেন্দ্র করে ভাইদের একটি ইলমী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হত। সভায় তিনি ইলম শিক্ষা করা এবং নির্দেশিত কিতাব মুখস্থ করার সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন।

তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী অধিকাংশ ভাই হিফজ করার জন্য আল্লামা শামরানী রহিমাহুল্লাহ এর ‘আল-জামি লিল-মুতূনিল ইলমিয়্যাহ’কে বাছাই করেন। কারাগারের লাইব্রেরিয়ানকে একদিন বলতে শুনেছি যে, তিনি আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ এর ‘বুলুগুল মারাম’-এর ৪০০ কপি ভাইদের জন্য ক্রয় করে এনেছিলেন। আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দান করুন।

ভাইয়েরা পূর্ণ মনোযোগ ও কঠিন অধ্যবসায়ের সাথে জ্ঞান অর্জন করা শুরু করেন। কারো মুতূন (কিতাবের মূল পাঠসমূহ) মুখস্থ হয়ে গেলে সাথে সাথে অধ্যয়নের জন্য তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ নির্বাচন করে নিতেন। এক্ষেত্রে যাদের সাথে এক কক্ষে কোনো তালিবে ইলম থাকত, তার খুব উপকার হত।

আমার সাথে একক কক্ষে এক তরুণ ভাই ছিল। সে ‘টক অব দ্য প্রিজন’ ছিল। (সবাই তার ইলম শিক্ষার ব্যাপারে আলোচনা করত) আল্লাহ তাআলা তার সামনে জ্ঞান অর্জনের দ্বার উনুক্ত করে দিয়েছিলেন। ভালোভাবে হিফজুল

কুরআন সম্পন্ন করার পর সে মুতুন মুখস্থ করার প্রতি আত্মনিয়োগ করে। অধিকাংশ মুতুন তার মুখস্থ হয়ে যায়। তার ভিতর এমন কিছু আমি লক্ষ করেছি, যা অন্য কারোর মধ্যে পাইনি। সে ‘যাদুল মুস্তানকি’এর মতন সম্পূর্ণরূপে ভালোভাবে মুখস্থ করে নিয়েছিল। আমি রোদে পায়চারি করার সময় সেও আমার সাথে হেঁটে হেঁটে ‘যাদুল মুস্তানকি’ থেকে মুখস্থ শোনাত। তারপর সে হিফজ করার জন্য ইবনুল মালিকের ‘আলফিয়্যাহ’ ক্রয় করল এবং ‘আল-মুনতাকা’র কিতাবুল জিহাদ পরিপূর্ণরূপে মুখস্থ করে নিল। তারপর আমার কাছে ‘আল-জামউ বাইনাস-সহীহাইন ওয়ায যাওয়ায়িদ’ মুখস্থ করার আগ্রহ প্রকাশ করলে আমি তার একটি কপি তাকে হাদিয়া দিলাম। আমাকে ঐ কক্ষ থেকে স্থানান্তরিত করার পূর্বে সে অনেক দূর পর্যন্ত মুখস্থ করে নিয়েছিল। আল্লাহ তার সহায় হন এবং তার ভুলত্রুটি শুধরিয়ে দিন।

নিঃসন্দেহে এটি জেলের দুর্বিষহ জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক অনুগ্রহ। এটার মাধ্যমে বন্দীর আত্মা ও ইলম শাণিত হয়। নিশ্চয় মুমিনের কোনো বিষয় উপকার ও কল্যাণ থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহ যাকে অন্তর্চক্ষু দান করেছেন, সে এটা উপলব্ধি করতে পারে।

[illegible]

[illegible]-

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

‘[illegible]’

[illegible]

না তার। বন্দী হওয়ার কারণে সে যা কিছু হারিয়ে ফেলেছে তা আল্লাহর কাছ থেকে পায়। (আল্লাহ বলেন) হে আদমসন্তান, আমাকে খোঁজ; তবেই আমাকে পাবে। আর আমাকে পাওয়ার অর্থ হলো- সবকিছু পেয়ে যাওয়া এবং আমাকে হারানোর অর্থ হলো- সবকিছু হারিয়ে ফেলা। সবকিছুর চেয়ে আমি তোমার নিকট প্রিয় হওয়া চাই।

কারাগারে আমি এমন কিছু আদর্শবান মানুষকে দেখেছি, যাঁদের ইবাদত সালাফে সালেহীনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি জেলে যাঁদের সাথে সময় ব্যয় করেছি, আমার বিশ্বাস- তাঁরা সকলেই আল্লাহর বুজুর্গ বান্দা ছিলেন। তাঁদের নিকট আমি ইবাদত-বন্দেগির উন্নত উপমা প্রত্যক্ষ করেছি। আমি কারাগারে এমন বান্দাদের সাথে সময় কাটিয়েছি, যাঁদের অন্তর ছিল পূত-পবিত্র, চেহারা ছিল নূরানী আভায় ঝলমলে, জিহ্বা ছিল সদা আল্লাহর যিকিরে মশগুল।

কিয়ামুল লাইল হলো অধিকাংশ বন্দীদের সাধারণ অভ্যাস। কিয়ামুল লাইলের ব্যাপারে শিথিলতা করে এমন বন্দী পাওয়া দুষ্কর নতুন কারাগারে আমি একটি কক্ষে ছিলাম। যখন রাতের তৃতীয় ভাগ আসত, তখন তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য জায়গা পাওয়া যেত না। জায়গা সংকীর্ণ হয়ে পড়ত। কারণ, তখন সবাই আল্লাহর সাথে একান্ত সময় কাটানোয় মশগুল থাকত।

নফল রোজার ক্ষেত্রে বন্দীরা একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে যারা একেবারে নিন্মস্তরের তারা সোমবার-বৃহস্পতিবার এবং আইয়্যামে বিয (প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ) এর রোজা রাখে। অনেকে শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন রোজা রাখে। এমন কতককেও আমি দেখেছি যারা কারাগারে যতদিন অতিবাহিত করেছে, ততদিনই রোজা রেখেছে। দুই ঈদ, তাশরীকের বাকি তিনদিন এবং স্বজনদের দেখতে আসার দিন ব্যতীত অন্য কোনো দিন রোজা না রেখে থাকেনি।

কুরআন হলো বন্দীদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কেউ দশ দিনে, কেউ সাত দিনে, আবার কেউ পাঁচ দিনে কুরআন খতম করে। রাতদিন তারা হিফজ, তিলাওয়াত এবং তাদাব্বুর (কুরআনের মর্ম নিয়ে ফিকির ও গবেষণা করা) এর মাধ্যমে কুরআনের উদ্যানে বিচরণ করে।

বন্দীদের জন্য রমজান মাস আলাদা গুরুত্ব রাখে। তারা অধীর আগ্রহে এ মাসটির অপেক্ষায় থাকে। কারণ, এটিই তো সত্যিকারের ইবাদতের মাস। অধিকাংশ বন্দী নিজেদের কক্ষসমূহে জামাতবদ্ধ হয়ে তারাবীর নামাজ পড়ে এবং এতে কুরআন খতম করে। আমার মনে আছে, প্রথম চালানে আমাদের পাশের কক্ষের বন্দীরা তারাবীর নামাজে দু’বার কুরআন খতম করত। ব্যক্তিগতভাবেও প্রত্যেকে আলাদাভাবে তাহাজ্জুদ পড়ে। আমার সাথে একজন প্রিয় ভাই ছিলেন। তিনি

তাহাজ্জুদে প্রতি তিন দিনে কুরআন খতম করতেন। প্রতিরাতে দশ পারা করে পড়তেন। আরেক কারাগারে অন্য এক ভাইয়ের সাথে ছিলাম, তিনি মাগরিবের নামাজের পরপরই তাহাজ্জুদ শুরু করে দিতেন। মাঝখানে জামাত সহকারে এশা ও তারাবীর নামাজ আদায় করে আবার ফজরের আজানের আগ পর্যন্ত তাহাজ্জুদে মশগুল থাকতেন। তারপর সাহরি’র (শেষভাগে) খাবার খেতেন। এভাবে পুরো রমজান জুড়ে আমল জারি রাখতেন।

রমজানে কারাগার থেকে মৌমাছির গুঞ্জরনের মতো তিলাওয়াতে কুরআনের মধুর গুঞ্জরন ভেসে আসে। প্রতি তিন দিনে একবার কুরআন খতম করা বন্দীদের জন্য স্বাভাবিক একটা আমল। এক ভাই তো প্রতি দু’দিনে একবার খতম করতেন। প্রতি নামাজের পূর্বে ৩ পারা করে প্রতিদিন ১৫ পারা তিলাওয়াত করতেন তিনি। আমার পরিচিত এক ভাই রমজানে প্রতিদিন একবার খতম করতেন। কারাগারের এক রমজানে তো তিনি ৩৩ বার কুরআন খতম করেছিলেন! আল্লাহ তাঁদের সকলকে কবুল করুন এবং তাঁদের মুক্তিকে তরান্বিত করুন।

জুলুমের জাঁতাকলে

কারাকর্তৃপক্ষ বন্দী ভাইদেরকে মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলতে চেষ্টা করে। তাদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল চুর্ণবিচুর্ণ করে দিতে চায়। তাদের প্রতিরোধশক্তি ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতাকে একদম বিনষ্ট করে দিতে চায়। যাতে তারা নিজস্ব যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং নিজ মানহায ও নীতিমালা থেকে সরে গিয়ে, আত্মপরিচয়হীন বিকৃত মস্তিষ্ক ও মানসিকতা নিয়ে জেল থেকে বের হয় এবং হক্বের এ পথে দ্বিতীয়বার পা না বাড়ায়।

একদিন আমি আছীরের কারাগারের মানসিক ডাক্তারকে বললাম, আপনারা এ ভাগ্যবান জেলবন্দীদের সাথে যা করেন তা তাদের জন্য পরীক্ষা। তাদের ওপর জুলুম ও নিপীড়ন যতই বাড়তে থাকে, তারা ভেঙে না পড়ে আরও খুশি হয় এবং এ সুসংবাদ গ্রহণ করে যে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন কারণ, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যে বান্দাকে ভালোবাসেন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। সবচেয়ে কঠিন বিপদ ও পরীক্ষায় তো নবীগণই পতিত হয়েছিলেন। তারপর যাঁরা নবীদের অনুসরণ করায় এগিয়ে ছিলেন তাঁরা, তারপর যাঁরা এর নিচের স্তরে ছিলেন তাঁরা- এভাবে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। আমার

কথা শুনে ডাক্তার বেচারার চেহারা একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমার দেখা সবচেয়ে খবিস ও শয়তান প্রকৃতির লোকদের অন্যতম ছিল এ ডাক্তার।

পুরাতন জেলখানায় কারাপ্রশাসনের নিকট আমরা কিছু দাবি উত্থাপন করলে আমাদের নিকট বিশেষ বন্দী বিভাগের প্রধান আসলেন।

দীর্ঘ বিতর্কের পর তিনি একদম স্পষ্টভাবে বললেন, কারাবিধি অনুযায়ী প্রত্যেক বন্দীর এটা অনুভব করতে হবে যে, সে একজন বন্দী। তার উদ্দেশ্য ছিল, প্রত্যেক অনুরোধকারীর অনুরোধ যদি পূর্ণ করা হয়; তাহলে জেল আর জেল থাকবে না। এজন্য জেলের ভিতর প্রত্যেক বন্দীকে কষ্টের জীবনযাপন করতে হবে এবং নিজেদের ভিতর এ জীবনের চাপ ও কষ্ট অনুভব করতে হবে।

অধিকাংশ কারাকর্মকর্তা বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক বিদ্যা অর্জন করে থাকে। এজন্য তারা বন্দীদের ওপর মানসিক চাপ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক উপায় ও সাইকোলোজিক্যাল মাধ্যম খুব সুচারুরূপে ব্যবহার করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ: জনৈক কর্মকর্তা আমাদের বলেছিল, ‘যখন আমরা দেখি যে, বন্দীরা বেশি আবেদন পেশ করতে শুরু করেছে এবং এটা ওটা চাইতে শুরু করেছে যেমন, কক্ষগুলো খুলে দিতে অথবা জেলের বিভিন্ন নিয়মকে আরেকটু শিথিল করতে অনুরোধ করে,

তখন আমরা সাথে সাথে মুদির দোকান থেকে সাবান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ক্রয় করতে নিষেধ করে দিই। এতে তারা আগের আবেদন থেকে সরে এসে সাবান ক্রয় করার আবেদনে ফিরে আসে। এভাবে সাইকোলোজিক পদ্ধতিতে তাদের আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করে দিই। উল্লেখ্য, আমার স্থানান্তরের আগ পর্যন্ত আছীরের কারাগারে সাবান নিষিদ্ধ ছিল।

জেল মানেই হলো- প্রতিটি বিষয়ে প্রেশার ও চাপ অনুভব করা। এখানে তোমার অবস্থান একটি দশমিক সংখ্যার মতো (যার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা ও অধিকার থাকে না)। যোগাযোগ, দেখাশোনা, গরম পানি, রোদ পোহানো, হাসপাতাল, আকস্মিক জিজ্ঞাসাবাদ, অন্ধকার সেলঘর, রিমান্ড, এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে স্থানান্তর, নির্দিষ্ট আবেদনের অধিকার, প্রশাসনের লোকদের সাথে আচরণ, বন্দী, হাতকড়া, মুখের ঠুলি ইত্যাদি যা কিছু জেলের মধ্যে আছে, প্রতিটা একেকটা প্রেশার ও চাপ।

টক লেবু থেকে মিষ্ট শরবত বানাতে হবে- এটাই জেলে আমাদের স্লোগান ছিল। অর্থাৎ কোনোভাবেই এসব চাপের প্রতি আত্মসমর্পন করা যাবে না। এগুলোর মোকাবেলায় সহজ একটা কৌশল বের করতে হবে। আর তা হলো, চিন্তার নিয়ন্ত্রণ। কারণ, এটা প্রমাণিত সত্য যে, চিন্তার কারণে দুঃখ ও পেরেশানির অনুভব

সৃষ্টি হয়; যার কারণে মানুষ চাপ ও প্রেশার অনুভব করে।

সুতরাং তুমি যদি তোমার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার দিক পরিবর্তন করে ফেলতে পার; তাহলে চিন্তা থেকে সৃষ্ট তোমার দুঃখ ও পেরেশানি বিদূরিত হয়ে তুমি চাপমুক্ত থাকতে পারবে। কারণ, দুঃখ ও পেরেশানিবোধ আসে চিন্তা থেকে।

মুজাহিদ বন্দীদের জন্য এটি খুব সহজ একটা কৌশল। এ কৌশলটির ব্যাপারে আমি একজন মানসিক বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করেছি। এ কৌশলের ওপর ভিত্তি করে বন্দীদেরকে সকল চাপ ও প্রেশারকে পরীক্ষা হিসেবে নিতে হবে এবং মনের মধ্যে এটা বসিয়ে নিতে হবে যে, বিপদ ও পরীক্ষায় ধৈর্য ধরলে বিনিময়ে সাওয়াব এবং আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়। তখন এ ধরনের চাপের সময় দুঃখ ও পেরেশানিবোধ হওয়ার পরিবর্তে আনন্দ এবং ভাগ্যবান হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হবে।

জেলে চাপমুক্ত থাকার জন্য অন্যান্য ভাইয়েরা নিজ নিজ কক্ষের মধ্যে চিন্তবিনোদন-মূলক প্রোগ্রাম করত। পুরাতন কারাগারে আমরা প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে সাপ্তাহিক একটা সেমিনার করতাম। সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন, কবিতা আবৃত্তি, বন্দীজীবনের উপকারিতা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতাম। বিনোদনের এ

পদ্ধতিটা রান্নাবান্না এবং ঈদের দিনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম থেকে বেশি উপকারী ছিল।

বন্দী ব্যক্তি সবসময় চায়, তার মনোবল যেন আকাশের মতো উঁচু থাকে এবং তার ইচ্ছাশক্তি যেন পাথরের মতো শক্ত থাকে; যাতে কারাকর্তৃপক্ষের সকল চক্রান্ত চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা শক্তি ও দৃঢ়তা প্রত্যাশাকারী এসব কয়েদিদের ওপর রহম করুন।

নিজেকে প্রস্তুত করার যত আয়োজন
কারাগারের ভিতর বন্দীর নিজেদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যকে সুন্দরভাবে তৈরি করে নেয়। তারপর জেলের দীর্ঘ অবসর সময়ের সদ্যবহার করে তারা সেগুলোর জন্য উপযোগী পরিকল্পনা ও প্রোগ্রাম নির্ধারণ করে নেয়। সময়কে তারা নষ্ট হতে দেয় না। কারণ, সময় নষ্ট করা এবং এর সদ্বব্যবহার না করার মানেই হলো- ধ্বংস এবং সমাধানহীন সমস্যায় পতিত হওয়া।

প্রোগ্রামের শুরুতে তারা ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হয়। ফলে তারা কায়মনোবাক্যে অধিকহারে নামাজ পড়তে থাকে। হৃদয়ের স্থিরতা ও প্রশান্তি কায়েম করতে খুশুখুযুর সহিত পড়া এ নামাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও আশ্চর্যজনক ভূমিকা রাখে। হৃদয়ের স্থিরতা ও প্রশান্তি- এ দুই বিষয়ই তো বন্দীদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন! ফরয ও ওয়াজিবের পাশাপাশি তারা সাধারণ নফল নামাজ এবং তাহাজ্জুদের প্রতিও অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এছাড়াও শেষরাত্রে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করা, গুরুত্ব সহকারে যিকির করা, প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং নফল রোজা রাখা...

ইত্যাদি আমলও খুব মনোযোগ সহকারে করে থাকে।

ইবাদতের পাশাপাশি ইলম অর্জনের মাধ্যমেও তারা ভবিষ্যতের পথকে সুগম করার দিকে এগোতে থাকে। এজন্য তারা নির্দিষ্ট মানহায ও গতিপথ নির্ধারণ করে নিয়ে ইলম অর্জনের পথে চলতে শুরু করে। প্রথমে কুরআন হিফজ কিতাবাদির অধ্যয়ন শুরু করে। তারপর সেগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো পর্যায়ক্রমে পড়ে নেয়।

তারপর নিজেদের বিদ্যা ও জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য মুক্ত অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করে। জেলে আমার সাথে এমন কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়েছে, যাদের হাতে সবসময়ই কিতাব থাকত। তাদের অনেকই দৈনিক কমপক্ষে ১০০ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করত। এমন একজনকেও আমি চিনি, যিনি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এর ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ এক বছরেরও কম সময়ে পড়ে শেষ করে ফেলেছিলেন।

ইবাদত ও ইলমের পাশাপাশি শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও নিজেদেরকে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত করে নেয়। কারাগারে দীর্ঘ সময় ধরে অলস বসে থাকার কারণে শরীর এবং শরীরের মাংসপেশী নরম ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এজন্য বন্দী মুজাহিদ রুটিন বানিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শারীরিক বিভিন্ন

ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে চাঙ্গা ও ফিট রাখেন।

বর্ণিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী যারা কারাগারের জীবন অতিবাহিত করে, তারা নিরন্তর সুখ ও শান্তিতে বন্দীজীবন অতিবাহিত করে থাকে। কারণ, এ প্রোগ্রামগুলো তাদেরকে জেলের চিন্তা ও পেরেশানি থেকে বিস্মৃত করে রাখে। এমনকি এক সময় তারা মুক্তিলাভ করার চিন্তাও করে না। তাদের মন সব সময় আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে। এ ধরনের বন্দীজীবনের মাহাত্ম্য কেবল তারাই বুঝতে পারবে, যাদের এ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে এবং যারা এ ধরনের বন্দিত্বের স্বাদ আস্বাদন করেছে।

কালোজাদুর কবলে
পুরো একদিনব্যাপী প্রশাসনিক লোকদের জ্বালাতনের পর নতুন জেলখানায় আমার একক সেলঘরে একদিন আমি বিছানায় শায়িত ছিলাম। ঘরের পরিবেশ নীরব-নিস্তব্ধ ছিল। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত বারোটার কাছাকাছি। আমার শরীরও আস্তে আস্তে ঢলে পড়ছিল ঘুমের কোলে। তখনই আমার পাশের সেলঘরটার দরজা খুলে বন্ধ করে দেওয়া হলো। বুঝতে পারলাম, এতদিন ধরে খালি থাকা আযকার ও দুআ পড়ে ঘুমের প্রস্ততি নিচ্ছিলাম, তখনই শুনলাম-পাশের সেলঘর থেকে কেউ আমাকে ডাকছে। আমি ডাক দেওয়া লোকটির দিকে কান খাড়া করলাম। এমনিতে সময়টা কথা বলার উপযোগী ছিল। কারণ, তখন নতুন কারারক্ষীদের ডিউটি জয়েন করা এবং বন্দীদের লিস্ট বুঝে নেওয়ার সময় ছিল। এ সময়ে একটু শিথিলতা থাকে। বাহির থেকে তাদের হাসির শব্দ ভেসে আসছিল। তার মানে তখন তারা কন্ট্রোল রুমের বাহিরে ছিল। মনে মনে আল্লাহর কাছে সিসি ক্যামেরা ও সিসি রেকর্ডার থেকে পানাহ চাইলাম। অনেক দিন পর আজ কোনো ভাইয়ের সাথে কথা বলার সুযোগ পেলাম। তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম।

‘আসসালামু আলাইকুম, কে আছেন আমার পাশে?’- এভাবে শুরু হলো আমাদের কথোপকথন। ছেলেটা দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারী। কথাও

বলে খুব গুছিয়ে। বুঝতে পারলাম, সে একুশ-বাইশ বছরের তাগড়া যুবক। আমরা এভাবে প্রতিদিন কথা বলতাম। এভাবে আমাদের মাঝে এক আশ্চর্যজনক হদ্যতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। জেলের ভিতর খুব করুণ কণ্ঠে আজান দিত সে। ভাঙা ভাঙা সেই কণ্ঠস্বর সবাইকে মায়ায় জড়িয়ে নিত। এভাবে সে ‘টক অব দ্য প্রিজন’ হয়ে ওঠে। তার সাথে তার দুই সহোদর ভাইকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের মামলা ছিল।

তাকে তার মোবাইলের বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নতুন পাবলিক কারাগার থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দু’সপ্তাহ যাবৎ তাকে সেলঘরের মধ্যে রাখা হয়। সেখানে থাকার জন্য তাকে কোনো বিছানা দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি কোনো কম্বলও। প্রচণ্ড শীতের মৌসুমে সে টাইলসের মেঝেতে কেবল গেঞ্জি আর প্যান্ট পরা অবস্থায় এ দু’সপ্তাহ অতিবাহিত করেছে। তদুপরি সেলঘরটিতে এয়ার কন্ডিশনার চালু থাকত সবসময়। পুরো দু’সপ্তাহজুড়ে তার হাতে হ্যান্ডক্যাপ এবং পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায় রাখা হয়। অজু, নামাজ, ঘুম ইত্যাদি সকল কাজ তাকে এগুলোর দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় করতে হয়েছে। দু’সপ্তাহ পর তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। এখানে এনে তাকে সামষ্টিক কারাকক্ষে না রেখে একক সেলঘরে

রাখা হয়। সে আমাকে বারবার বলত, কেন্দ্রীয় কারাগারে যে ভাইয়েরা আছেন , তাদের জন্য দুআ করতে কখনো ভুলবেন না। তারা সেখানে কঠিন শাস্তির মধ্যে আছেন।

কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফিরে ছেলেটা আমাকে খুব আশ্চর্যজনক একটা ঘটনা শোনাল। সে বলল , কেন্দ্রীয় কারাগারের সেলঘরে থাকার সময় আমার সাথে এক জিন তরুণী কথা বলেছিল। জিন মেয়েটি আমাকে বলেছিল , তোমার প্রভূ তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। আমিই তোমার উপকার করতে পারব। (নাউযুবিল্লাহ)। সে (ছেলেটি) আমাকে তার ভিতর বিভিন্ন কুমন্ত্রণা ও শয়তানি প্ররোচনার অস্তিত্ব অনুভব করার অভিযোগ করল। আমি তাকে সকাল -সন্ধ্যার আযকার এবং প্রত্যেক নামাজের পর আয়াতুল কুরসী , সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ার পরামর্শ দিলাম। প্রতিদিন পূর্ণ সূরা বাকারা তিলাওয়াতও করতে বললাম। কারণ, এ আমলগুলোতে অনেক বরকত রয়েছে। এগুলোর ওপর আমল না করলে পরে আফসোস করতে হয়। এছাড়াও এ আমলগুলো জারি রাখলে জাদুটোনা ইত্যাদি কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ □□□□□□-

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত খুবই “ ”দুর্বল।

জিজ্ঞাসাবাদের অফিসাররা কখনো কখনো বন্দী মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে এ ধরনের জাদুটোনা ব্যবহার করে থাকে। তাদের এ চক্রান্ত খুবই দুর্বল প্রমাণিত হয়। আল্লাহর কালামের সামনে এ ধরনের হীন চক্রান্ত একদম অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। বন্দীজীবনে কালোজাদুর কবলে পড়া অনেকটা অনুমিত। অনেক বন্দী ভাইকে এর মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে শেফা দান করেছেন।

যোগাযোগের চেইন
কড়া নিরাপত্তায় পরিচালিত কারাগারগুলো অন্তরণ তত্ত্ব অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অর্থাৎ এখানে বন্দীদেরকে পরস্পর থেকে একদম বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় এবং তাদের পারস্পরিক যোগাযোগের সকল মাধ্যম নিষিদ্ধ করা হয়। তাদের মাঝে সাক্ষাৎ, মোলাকাত, কথোপকথন এমনকি সালাম দেওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়। বন্দীদের ওপর সহজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, তাদের ওপর মানসিক প্রেশার প্রবল করা এবং তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা বন্ধ করার জন্য এসব করা হয়।

এ অন্তরণ বা বিচ্ছিন্নতা দু’ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমটা হলো- একক বিচ্ছিন্নতা। এখানে কেবল একজন মানুষের অবকাঠামো-সমান (৭.৫ বর্গ মিটার) একটি রুমে একজন বন্দীকে রাখা হয়। সাধারণ (কারাকতৃপক্ষের ধারণা অনুযায়ী) যাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অন্যান্য বন্দী প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাদেরকে এ ধরনের ঘরে রাখা হয়। আমাদের বড় বড় অনেক শাইখকে বছরের পর বছর এ ধরনের সেলঘরে রেখে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আমাকে দু’বার এ ধরনের সেলঘরে রাখা হয়েছিল। প্রথমবার যাহবানের কয়েদখানায়, দ্বিতীয়বার পূর্ণ এক বছর যাবৎ আছীরের কারাগারে। বিচ্ছিন্নতার দ্বিতীয় প্রকার হলো- সামষ্টিক

বিচ্ছিন্নতা। এ প্রকারের বিচ্ছিন্নতায় বন্দীদের যে ধরনের কক্ষে রাখা হয়, তাকে জামাআ বা সামষ্টিক কক্ষ বলা হলেও বস্তত এগুলোও একেকটি সেলঘর৷ তবে প্রথম প্রকারের চেয়ে এগুলো আকারে একটু বড় (৩০ বর্গ মিটার) হয়ে থাকে। এর প্রত্যেকটিতে একাধিক বন্দী রাখা হয় এবং অন্য কক্ষের বন্দীর সাথে যোগাযোগের সকল ব্যবস্থা ও মাধ্যম নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। অমান্য করলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। বন্দীদেরকে এ ধরনের কক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে রাখা হয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। সপ্তাহে একবার ২৫ মিনিটের জন্য বাহিরের আলো- বাতাসে বের করা হয়। কারারক্ষীদের মানসিক অবস্থাভেদে সময়ের ক্ষেত্রে কিছুটা কমবেশিও হয়ে থাকে। এছাড়া অন্য কোনো কারণে একদম বের হওয়া যায় না। অবশ্য বিশেষ কোনো প্রয়োজনে যেমন, পরিবারের লোকেরা দেখতে আসলে কিংবা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হলে বা এ ধরনের অন্য কোনো বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িক বের হওয়ার সুযোগ থাকে। পুরাতন কারাগারের সামষ্টিক গারদ নামে প্রসিদ্ধ ৩ নং ওয়ার্ডের ফটকে আরবি ও ইংরেজি ভাষায় লেখা আছে, পূর্বের সেলঘরটিতে ১০ জন বন্দী রাখা হয়।

আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমাদের ওপর অনৈতিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া এ বাধা ও নিষেধাজ্ঞাকে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করলাম।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি রহম করে আমাদের মাঝে যোগাযোগের বিভিন্ন পন্থা ও রাস্তা খুলে দিলেন। কারাগারের বিধি-বিধান যতই কঠিন হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত এসব তো মানুষেরই তৈরি। এজন্য এতেও অনেক ফাঁক-ফোকর ও দুর্বলতা ছিল। আল্লাহর মেহেরবানিতে আমরা চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে যোগাযোগের একটা নেটওয়ার্ক গঠন করে ফেলি। বাহ্যিকভাবে কলম নিষিদ্ধ ছিল; তবুও গোপনে গোপনে আমরা বাহিরে থেকে কলম সংগ্রহ করলাম। কাগজ নিয়েও আমাদের কোনো চিন্তা ছিল না। অন্তত লেখা যায় এমন অনেক কিছুই জেলের ভিতর ছিল। আমরা সেগুলোতেই লেখা শুরু করলাম। শুরুতে আমাদের এ নেটওয়ার্ক আমাদের এক ওয়ার্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর কিছুদিন পর আস্তে আস্তে অন্যান্য ওয়ার্ডগুলোতে এটি ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমরা কখনো কখনো মহিলা ওয়ার্ডে রাখা বন্দী ভাইদের সাথেও যোগাযোগ করতে সক্ষম হতাম। পুরাতন জেলখানায় যারা থাকত, তারা কেন্দ্রীয় ওয়ার্ডসমূহ থেকে মহিলা ওয়ার্ড কতটুকু দূরত্বে আছে তা জানত।

একদিন বিদেশি বন্দীবিভাগীয় প্রধান আমাকে ডেকে বলল, ‘তোমাদের কক্ষ যে রীতিমতো বন্দীদের পোস্ট অফিস বনে গেছে এ খবর আমাদের কারাকর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনিক

লোকদের নিকট আছে।’ আসলে আমাদের গোপন নেটওয়ার্ক কখনো কখনো ফাঁস হয়ে যেত। তখন আমাদের নেটওয়ার্ক বা যোগাযোগ ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হত। আবার কখনো কখনো তীব্র বাধা ও প্রতিরোধ আসত। তখন আমাদের নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেওয়া হত। তখন আমরা আবার একদম শুন্য থেকে ধীরে ধীরে নতুন নেটওয়ার্ক তৈরি করে নিতাম।

আমরা পরস্পরে চিঠিপত্র, কবিতা, বিভিন্ন বিনোদনমূলক বিষয়, হাদিয়া, বন্দীদের বিভিন্ন উদ্ভাবন ইত্যাদি শেয়ার করতাম। সকল খবর এবং সাম্প্রতিক ও সর্বশেষ অবস্থা একজন থেকে অপরজন হয়ে সবার মাঝে পৌঁছে যেত।

আমাদের মাঝে ছাত্র, সাহিত্যিক, কবি, অভিজ্ঞ পেশাজীবী এবং সাংবাদিক নানা ধরনের মানুষ ছিল। অনেক বন্দী বন্ধুদের সাথে আমাদের দেখা না হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাদেরকে ভালোভাবে চিনতাম, জানতাম। আমাদের মাঝে গড়ে ওঠেছিল শক্ত ভ্রাতৃত্ববন্ধন। বন্দী ভাইদের সাহিত্যমান কতটা উন্নত ছিল, তা তাদের বিভিন্ন লেখা থেকে প্রমাণিত হয়। তাদের চিঠিগুলো হত ছন্দোবদ্ধ ও আলংকারিক সৌন্দর্যে ভরপুর। প্রতিটা বাক্য ছিল অনুপম ও শিল্পনৈপুণ্যে টইটুম্বুর! যেন হৃদয়নিংড়ানো কালি দিয়ে লেখা সেগুলো। কলমের কালি দিয়ে বের

হওয়ার পূর্বে কথাগুলো যেন হৃদয়ের ক্ষুধার্ত ও উষ্ণ অনুভব এবং জীবন্ত অনুভূতির মাঝে বিচরণ করে এসেছে। অনেক ভাইয়েরা স্মৃতির ডায়েরিতে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য তাদের লেখাগুলো গোপনে কারাগারের বাহিরে পাঠিয়ে দিতেন।

জিজ্ঞাসাবাদকারীর সাথে
আমার বন্দীজীবনের ১২ বছরের মাথায় আমি আমার মামলা-মুকাদ্দমার অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদকারীর সাথে সাক্ষাৎ করার আবেদন করলাম। ২ সপ্তাহ পর আমার ডাক আসল। সরকারি বাহিনীর লোকেরা আমাকে চোখ বন্ধ করে, হ্যান্ডক্যাপ পরিয়ে নতুন কারাগারের সেলঘর থেকে পুরাতন কারাগারে নিয়ে যাওয়ার জন্য বের করল। প্রিজন ভ্যানে করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা পুরাতন কারাগারের ভবনে পৌঁছে গেলাম। দুই কারাগারের মাঝে দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। ছয় বছর পূর্বে এখান থেকেই প্রবেশ করছিলাম, তখন পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলো আমার ভিতর জেগে উঠতে লাগল- আহা, এখানে আমার কত আপনজন ছিল! মলিন হয়ে যাওয়া অতীত স্মৃতিগুলো আমার সামনে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠল। স্মৃতির ধূলিধূসর পাতাগুলো একের পর এক খুলে যেতে লাগল আমার দৃষ্টির সামনে। আত্মহারা হয়ে আমি পথ চলছিলাম। পরে এক পুলিশ আমাকে সিড়িতে চড়তে বললে আমার সম্বিৎ ফিরল। পরে ছোট একটি সিড়ির সামনে আমি তাকে সতর্ক করলে সে খুবই অবাক হল।
আসলে পুলিশটা এখানে নতুন ছিল।

আমাকে হালকা হলুদ আলোয় সজ্জিত মনবিষন্নকারী ভীতিকর একটি কক্ষে প্রবেশ করানো হলো। এটাই জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ। এখানকার একটা পুরাতন নিয়ম হলো, এখানে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মধ্যরাতে ডাকা হবে। এবং আপনাকে ঘণ্টা দুই ঘণ্টা অপেক্ষায় রাখবে। আমার মামলার ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল, সে কয়েক বছর পূর্বে মারা গিয়েছিল। যাই হোক, আমিও অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অপেক্ষা কাজটা বোরিং (বিরক্তিকর); কিন্তু এসব আমাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমি কুরআন মাজীদ থেকে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলাম, যেগুলো তিলাওয়াত করলে মনে প্রশান্তি ও স্থিরতা আসে।

অবশেষে জিজ্ঞাসাবাদকারীর আগমন ঘটল। এসেই আমাকে বলল, ‘আপনার খুব দেরি করে ফেললাম বুঝি!? আসলে তা নয়, আপনাকে একটু রেস্ট নেওয়ার সময় দিচ্ছিলাম! আমি তাকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে অনেক্ষণ ধরে এটা সেটা নিয়ে বকবক করল। কথা বলার সময় হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় আসল। আমি তাকে একজন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে অনুরোধ করলাম। (ঐ ভাইকে আমার সাথে একই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। অনেক বছর ধরে তার দেখা পাচ্ছিলাম না। তার

পরিণতি সম্পর্কে আমার আশা ও সংশয় উভয়টিই ছিল)

সে অনুরোধ নাকচ করে দিল। তারপর বলল, এখনো দেখি সে পুরোনো গোমরাহিতে আছেন!! তার কথা শুনে আমার খুব হাসি পেল।

কক্ষ নং-১১৬
বন্দীজীবনের কিছু স্মৃতি বছরের পর বছর জুড়ে আমার অন্তরলোকে প্রতিধ্বনিত হয়। কিছু মুহূর্ত খুবই মধুর হয় যেগুলোর স্বাদ ও সুবাস এখনো অনুভব করি আমার ভিতরে। পুরাতন জেলখানার ৩ নং ওয়ার্ডের ১১৬ নং কক্ষ আমার জেলজীবনের সবচেয়ে সুন্দর আবাসস্থল ছিল। অনেক বছর সেখানে কাটিয়েছি আমি। প্রতারণামূলক কৌশলের মাধ্যমে আমাকে এখান থেকে বিচ্ছিন্ন সেলঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বন্দিজীবনের এ সুন্দর বছরগুলোর অনেক মধুময় স্মৃতি আছে। কক্ষটাতে সম্ভবত ৪ জন শহীদ অবস্থান করেছিলেন। তাঁরা ২২-৩-১৪৩৭ হিজরী তারিখে ফাঁসি কার্যকর করা আহলে সুন্নাতের মোবারক মুজাহিদ বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের সকলকে কবুল করুন। তাঁরা হলেন, নাসির ইবনে আলী আল-কাহতানী রহিমাহুল্লাহ (আবু সারা), তাঁর ভাই ফাহাদ ইবনে আলী আল-কাহতানী রহিমাহুল্লাহ (আবু আলী), মুআইদ আল-কাহতানী রহিমাহুল্লাহ (উবাইদা) এবং অপরজন সম্ভবত ফকীহ খাল্লাদ রহিমাহুল্লাহ।

আবু সারা রহিমাহুল্লাহ এর সাথে আমার বিশেষ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বেহেশতি সৌহার্দ ছিল আমাদের মাঝে। তাঁর

প্রতি আমার হৃদয়ে কী পরিমাণ ভালোবাসা ছিল? তা কলম দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন আমার প্রাণ, আমার চক্ষু শীতলকারী, আমার হৃদয়রাজ্যের রাজা। ভাইয়ের যত অর্থ হতে পারে, সকল অর্থে তিনি আমার ভাই ছিলেন। এ কক্ষটি আমাদের বৈঠক, আমাদের কথোপকথন এবং গল্পগুজবের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি ছিলেন সত্যিকারের ভ্রাতৃত্বের বাস্তব উদাহরণ, অনুপম চরিত্রের মডেল। তাঁর ফাঁসির সময় দায়িত্বে থাকা এক কারারক্ষী বলেছেন যে, তিনি তাঁর মরদেহ থেকে মিশকের সুবাস পেয়েছেন। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁকে শহীদদের দলে অন্তর্ভূক্ত করে নিন।

আর তাঁর ভাই আবু আলী রহিমাহুল্লাহ এর মতো ইবাদতগুজার ও আল্লাহভীরু বান্দা আমি আর দেখিনি। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ আবেদ, তাকওয়াবান বুজুর্গ। তাঁর ইলমও ছিল প্রচুর যেন একটা ভ্রাম্যমান কিতাব। রোজা, তাহাজ্জুদ এবং আল্লাহর প্রতি একাগ্র হয়ে ইবাদত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। ১৪৩০ হিজরীতে আমি একটি স্বপ্নে দেখলাম যে, কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে এবং সকল মানুষ হিসাবের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন- হে আল্লাহ, আমাদের সামনে বিরাজমান হন; যাতে আমরা আপনাকে দেখতে পারি। তখন আল্লাহ তাআলা

বললেন- হ্যাঁ, আমি আসছি। তারপর আল্লাহ বললেন- হে আবু আলী, দাঁড়াও এবং লোকদের নিয়ে নামাজ পড়। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁকে শহীদদের দলে অন্তর্ভূক্ত করে নিন।

আর উবাইদা রহিমাহুল্লাহ এর কথা কী বলব? তিনি ছিলেন সিংহহৃদয়; তবে মুমিন ভাইদের প্রতি ছিলেন নরম কোমল। মেঘ যেমন তার ভক্ত ও হিংসুক সকলকে সমানভাবে স্নাত করে, তেমনি তিনিও সকল মুমিনের সাথে সব সময় ভদ্র ও শান্ত আচরণ করতেন। কঠিন দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন সদা অটল। আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ ও বিসর্জনের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকতেন তিনি। হারামাইনের অনেক জিহাদী অপারেশন পরিচালনা করেছিলেন তিনি। জিহাদী অপারেশনগুলোর ভিত্তি স্থাপন করার সময় সকল কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতি তিনি অতুলনীয় ধৈর্যের সাথে সামাল দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁকে শহীদদের দলে অন্তর্ভূক্ত করে নিন।

আর খাল্লাদ রহিমাহুল্লাহ ছিলেন আমাদের কক্ষের হাসি-আনন্দের মধ্যমণি। তিনি প্রথম সারির মুজাহিদ ছিলেন। ১৪২৩ হিজরীর রিয়াদের রওশানে হামলাকারী অন্যতম বীর ছিলেন তিনি। মিষ্ট ও নরম স্বভাব এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মৃত্যুর পর এক ভাই তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি (খাল্লাদ) তাকে বললেন, আল্লাহর রাস্তায়

শহীদ হওয়া কতই না মধুর! আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁকে শহীদদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

কবিতা
যে অশ্বারোহীগণ আমার ভয়কে জয় করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে,
তীব্র লড়াইয়ের সময় যারা মৃত্যুর পরোয়া না করে লড়াই চালিয়ে গেছে;
সেসব অশ্বারোহীদের ওপর আমার প্রাণ এবং আমার সকল কিছু কুরবান হোক।

ভ্রাতৃত্ববোধ
ভ্রাতৃত্ববন্ধন যখন হয় শুধু আল্লাহর জন্য, তখন তা নিশ্চিত প্রেরণা যোগায়; সুবাস ছড়ায়। যে এর স্বাদ আস্বাদন করেছে, এর মধুরতা চোখে দেখেছে, সে নিশ্চয় তা অনুধাবন করতে পারবে। কারাগারেই ভালোবাসার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে। এখানে সত্যিকারের বন্ধুত্ব, ঘনিষ্টতার বাস্তবতা, ভ্রাতৃত্বের গভীরতা ও আন্তরিকতার ধারাবাহিকতা ফুটিয়ে তোলা যায় সহজেই।

বন্দী ভাইয়েরা তৈরি করেছেন এক আলোর পাণ্ডুলিপি। অনুভবের কালি দিয়ে মনের শুচিতার আঁচড়ে এঁকেছেন সেখানে ভ্রাতৃত্বের কত শত বর্ণিল আলপনা! সবার হৃদয়গুলি। যেন ভ্রাতৃত্বের সীসাঢালা প্রাচীর! একে অপরের প্রতি অসম্ভব বিনয়ী। আছে অফুরান ভালোবাসা। আন্তরিকতার অভাব কল্পনা করাও অবান্তর।

বন্দী সেলগুলোতে ভাইদের মাঝে চলে তুমুল প্রতিযোগিতা। থালাবাসন ধোয়া, কক্ষ পরিষ্কার করা, বাথরুম সাফ করা, খাবার রিসিভ করা ও দস্তারখানা মুছার মতো কাজগুলো করে দেওয়ার জন্য তারা এমন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। বড়রা ছোটদের স্নেহ করেন। ছোটরা বড়দের সম্মান করেন।

আমাদের সাথে খুবই আদর্শবান যোগ্য এক ভাই ছিলেন। তিনি অন্ধ ছিলেন। ইরাকের রণাঙ্গনে হারিয়েছেন দু’চোখ। সেই যারকাভী রহিমাহুল্লাহ এর সময়েই। আমাদের মাঝে তিনিই ছিলেন খেদমতের প্রতি সবচেয়ে আগ্রহী। আল্লাহ! তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন। তিনিই খাবার রিসিভ করতেন। বাথরুম পরিষ্কার করতেন। এ নিয়ে আমরা খুব দ্বিধাদ্বন্দে ছিলাম। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। দৃষ্টিশক্তি না থাকায় শত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি খেদমত করেই যাবেন। কত যে নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী, তা বুঝানো মুশকিল! কিন্তু সৈন্যদের প্রতি যখন রাগান্বিত হতেন, শোনা যেত বাঘের গর্জন। তাই সৈন্যরা তাঁকে ভয় পেত। কাছে ভীড়ত না তাঁর। তারা জানত, একে রাগালে সমস্যা আছে।

আমাদের সেলের নিয়ম ছিল, পরিবারের সাথে সাপ্তাহিক যোগাযোগের পর, সবাই গোল হয়ে বসে যেতাম। প্রত্যেকে পরিবার-পরিজন থেকে প্রাপ্ত গরম গরম খবর পরিবেশন করতেন। তাদের সার্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতেন। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে তাও বলার সুযোগ ছিল। এভাবে সকলে সকলের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতেন। আমরা ছিলাম এক পরিবারের মতো। সবার পরিবারের সদস্যদের নাম আমাদের মুখস্থ ছিল। তাদের ছোটখাটো বিষয়েও আমরা অবগত ছিলাম। আমাদের

বিভিন্ন জটিল বিষয়ে আলোচনাও হত। আমরা পরামর্শে বসে একটা সমাধানও বের করতাম।

সহযোগিতা-সহমর্মিতার কী অনুপম আদর্শ! ভ্রাতৃত্ব-ভালোবাসার কী মুগ্ধকর দৃশ্য! ভাইগণ একে অপরের খোঁজখবর রাখছেন। কারো সমস্যা হলে তা সমাধানে এগিয়ে আসছেন। কারো মন খারাপ হলে তাকে প্রবোধ দিচ্ছেন। সত্যের সাথে একে অপরকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। তাদের মাঝে আছে দরিদ্র, অনাথ ও অসহায়। তাদের প্রতি কারো বিরক্তি নেই। বরং তাদের মন ভালো রাখতেই সবাই সচেষ্ট। তাদের অভাব পূরণেও কারো চেষ্টার কমতি নেই। ভেদাভেদ শুন্যের কোটায়। ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তা হাওয়া হয়ে গেছে। আমাদের গন্তব্য ভিন্ন হলেও কাজ একটাই। পারস্পরিক সহযোগিতার চুড়ায় আরোহণ করা এবং হৃদয় উজাড় করে দেওয়ার অনন্য নজির স্থাপন করা।

আয়ারল্যান্ডের এক প্রতিবন্ধী ভাই ছিলেন। তাঁর এক হাত অবশ ছিল। আমি কিছুদিন তাঁর সাথে একই রুমে থাকি। এক ভাই তাঁর সব কাজ করে দিতেন। একদম সব কাজ। মা যেমন তার বাচ্চাকে (সব কাজ) করে দেন। খাবারদাবার থেকে গোসল-বাথরুম পর্যন্ত। সবই মনের আনন্দে হৃদয় উজাড় করে করে দিতেন। কত উচু সংকল্প! তাঁদের কাছেই শিখেছি বন্ধুত্ব, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা কেমন হতে হয়? কত মহান

আমার সম্মানিত ভাইগণ! কত বিশাল তাঁদের হৃদয়!

আনুমানিক পাঁচবছর পরিবারের সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ ছাড়া কারাগারে অবস্থান করেছিলাম এক সময়। সেই রাতটি আমি ভুলতে পারব না কখনো। সেদিন প্রিয় ভাই শহীদ নাসির বিন আলী আল-কাহতানী রহিমাহুল্লাহ কে মামলার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। বৈঠক শেষে তাঁকে বলা হয় যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় আমার পরিবারকে আমার সাথে দেখা করার অনুমতি প্রদান করেছে। নাসির ভাই সেলে এলেন। তখন আনুমানিক রাত দশটা। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। রুমের সব ভাইকে তিনি সুসংবাদ প্রদান করলেন। আমার পাশের ভাইটিকেও বললেন। কিন্তু আমাকে জাগালেন না। খবরটি জানানোর জন্য পুরো রাত আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলেন। সুবহে সাদিকের একটু পূর্বে আমার ঘুম ভাঙে। তিনি খুশি মনে আমাকে সংবাদটি জানালেন। আমাদের মাঝে যে কত ভালোবাসা ছিল, আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসেবে করুল করুন। আমীন।

সুদানী ভাইটির বিশ্বস্ততার দৃশ্যটি আমি কখনো ভুলতে পারব না। তিনি আমার সাথে একই রুমে থাকতেন। তাগুত সরকার তাঁকে মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানের সাথে দেখা করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। যেদিন তিনি মুক্তি পেলেন এবং সুদান গেলেন, প্রথমেই

বিমানবন্দর থেকে সরাসরি আমার বাড়িতে চলে গেলেন। শুধু আমার পিতামাতাকে সালাম জানানোর জন্য। তাঁর বাড়িতে যাওয়ার আগেই। তাঁর পিতামাতাকে দেখার আগেই। অথচ, কত বছর পর তিনি ফিরছেন! এই হলো এসব মানুষের বিশ্বস্ততা।

এ তো বিশাল সাগরের একটি বিন্দু মাত্র। অসংখ্য বরকতময় মুহূর্তের একটি মুহূর্ত মাত্র। সবকটি যদি কাগজে তুলে আনি, এ কয়েক লাইনে মোটেও সংকুলান হবে না। সেসব মূল্যবোধ ও মর্যাদাসম্পন্ন, অঙ্গীকারে অবিচল এবং স্বীয় পালনকর্তার পথে দৃঢ়চেতা সিংহপুরুষের অবদান কি কেউ বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে? যাঁরা ঘুটঘুটে অন্ধকার, কঠিন সংকট ও পাহাড়সম মুসীবতকে থোড়াই কেয়ার করেন। আল্লাহ! আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমরা তাঁদেরকে শুধু আপনার জন্য ভালোবাসি। আল্লাহ! তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হন। তাঁদের মুক্তি দিন। সব ধরনের দুশ্চিন্তা থেকে তাঁদেরকে পরিত্রাণ দিন। সব ধরনের সংকটের সমাধান দিন।

আশাবাদী মনের আলপনা

অধিকাংশ মুজাহিদই নিভৃতচারী। অধিকাংশই...! তাঁরা এতই দৃঢ়চেতা যে, পাহাড়ও টলে যায় তাঁদের সামনে।
তাঁদের নিদর্শন হলো- সংযত কথন.. প্রশান্ত হৃদয়.. নিঃশব্দ কর্মপ্রয়াস..
আমীরের আনুগত্য.. ব্যাপক লজ্জাবোধ ও উন্নত শিষ্টাচার..
ময়দানে নিজেকে টিকিয়ে রাখার দুর্বার আগ্রহ..
আরাম আয়েশের পরিবেশ থেকে পলায়ন করা…

অধিকাংশ মুজাহিদই নিঃশব্দ-নিশ্চুপ। তাঁরাই কিতালের সুন্নাহ বাস্তবায়ন করেন। জিহাদের ফরয পালন করেন। পবিত্র এ পথে এগিয়ে যান। শত ঝড়-ঝাপটাকে উপেক্ষা করে। শত বিপদাপদকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে। তাঁরা এগিয়ে চলেন। তাঁদের জন্য খুলে যায় আসমানের দরজা। হৃদয়গুলি স্বীয়প্রতিপালকের সাথে জুড়ে যায়। উর্ধ্বজগতে পতপত করে ওড়ে তাঁদের রূহগুলি। মুক্ত আকাশে সবুজ পাখিদের সাথে ঘুরে বেড়ান তাঁরা। এগিয়ে চলেন উৎসাহের ডানা মেলে। বন্ধুর পথের কষ্টগুলির কোনো পরোয়া করেন না। ক্লেশ-ক্লান্তি যাঁদের

কাছে মধুর। ধ্বংস যাঁদের কাছে সুস্বাদু- মজাদার।

সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে যখন একবার দৃষ্টি বুলান, অথবা পুরো পথজুড়ে পার্থিবজীবন মোহময়তা ছড়ায়, তখন তাঁদের সেসব বন্ধুর কথা মনে পড়ে; যাঁরা হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে আছেন। সেই পূর্বের শহীদগণের কথা তাঁদের হৃদয়ে ঝড় তোলে। চলার পথে আসে গতিময়তা। কর্মে আসে প্রাণচাঞ্চল্য। এইতো বুঝি তাঁদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন! তখন মৃত্যুই হয় অন্তিম অভিলাষ! আমাদের সারি থেকেই সেই পথ অবলম্বন করেন অনেকে। আমাদের চোখে চোখ রেখেই আলিঙ্গন করেন শাহাদাতকে। আমাদের বড়রাও সে পথে চলেন। আমাদের সিংহরাও রক্তসাগরে ঝাপিয়ে পড়েন। তাঁরা আমাদের প্রিয়তম। তাঁরাই এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা-সালাম।

হৃদয়ে খোরাসান
‘শীঘ্রই তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে...’

আফগান জিহাদ চলমান। আগামীতে তা উম্মাহর জন্য এক আদর্শ বিদ্যাপীঠে পরিণত হবে। এটিই প্রথম ময়দান, যেখানে মুজাহিদগণ জড়ো হয়ে একটি মৃত সুন্নাহকে জীবিত করেছেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’র কাজ থমকে যাওয়ার কয়েক দশক পর তা পুনরায় চালু হয়েছে। ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায় যখন আমরা পাঠ করি, তখন আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে যায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা। সেসব দিনের ঘটনাবলি, সাংগঠনিক কাঠামো, পরিপক্ক চিন্তার হালচাল, শরীয়াহ ব্যবস্থার মুলোৎপাটন, সংকটের বাস্তবতা পুরোপুরি অনুধাবন, ইসলামী দলগুলি, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কুটখেলা, স্নায়ুযুদ্ধ এবং পরিশেষে মুসলমানদের স্বার্থসমূহকে গলা টিপে হত্যা করার বিষয়গুলো ভালোভাবেই বুঝতে হবে।

পেশোয়ার ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক ময়দান। সকলেই তাতে কাজ করতেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে যোগ দিয়েছেন সত্যবাদী নিষ্ঠাবান বন্ধুরা। তবে তা ছিল এক বিস্তির্ণ চারণভূমি। যেখানে চালাচালি হতো বিশ্বের সব খবরাখবর। যেখানেই জিহাদের

পতাকা উত্তোলন করা হবে সেখানেই এমন ময়দান আবার ফিরে আসবে। অন্যের কাছ থেকে যে শিক্ষা নিয়েছে, আফগান জিহাদ থেকে যে শিখেছে এবং উপকৃত হয়েছে, সে-ই সৌভাগ্যবান।

পরিশেষে যে বিষয়টি আমাদেরকে ভাবায় তা হলো পরিণাম ও ফলাফল। শক্রবাহিনী ও বিশ্বকাফেরকুল অনেক কিছুই করতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো তাঁর আলোর পূর্ণতা দেবেনই। তো জিহাদ বিস্তৃত হলো। মুজাহিদগণ ছড়িয়ে পড়লেন বিশ্বজুড়ে। আল্লাহর অশেষ দয়ায়। অতঃপর.. নীরব-নিঃশব্দ মুজাহিদগণের দৃঢ়তা! আফগানের ভিতরেই! যারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন পেশোয়ার থেকে। সেখানকার সংঘাত-যড়যন্ত্র থেকে।

অসম ধৈর্য ও অমিত সাহসের অধিকারী তাঁরা। স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অবিচল আস্থা এবং তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে অটুট বিশ্বাস। তাঁদের মাঝ থেকেই বেরিয়ে এল মুজাহিদীনের কাফেলা। ছড়িয়ে পড়ল মিশর, আলজেরিয়া, লিবিয়া, তাজিকিস্তান, বসনিয়া, চেচনিয়া, ইরিত্রিয়াসহ পৃথিবীর বহু দেশে।

নীরব-নিঃশব্দ মুজাহিদের দল। দলিলসহই আল্লাহর ইবাদত করেন। সময়ের যথাযথ দায়িত্ব ও অবশ্যপালনীয় কর্তব্য জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’র মাধ্যমেই তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন। দুর্বলদের পক্ষে

প্রতিরোধ গড়েন। মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করেন। শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যান নিরন্তর।

আলেম বা দাঈ কিংবা মুজাহিদনেতা- যেই হন না কেন, পাড়ি দিতে হয় জীবনের নানা স্টেশন। ঠিক অন্য মানুষের মতো। এসব স্টেশনে স্বল্পতা ও পিপাসা কতো রূপ ধারণ করে! কখনো পাল্টে দেয়। কখনো ফিরে আসে। কখনো ফিরিয়ে দেয়। আমরা দৃষ্টি ফেলি তার জীবনের সর্বশেষ স্টেশনে। তিনি যেখানে এসে থমকে দাঁড়ান। আমরা তাঁর অল্পেতুষ্টি দেখি। তাঁর সবর ও ধৈর্য জেনে নিই। সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এর উক্তি কি আমরা ভুলে গেছি? তিনি বলেন, ব্যক্তির নিষ্কলুষতা কখনো আদর্শ বিকৃতির সমান হতে পারে না।

অনেকেই আফগান জিহাদে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা লিখেছেন।

এসবের ব্যাপারে আমার কোনো আশঙ্কা নেই। যেই তা পড়বে, কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হবেই। কোনো একটি বিষয়ই তার মনোযোগ কাড়বেই। আর লেখকই স্বয়ং সেসব ঘটনার সাক্ষী। তাকেই কিয়ামত দিবসে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হে মুজাহিদগণ!

ওগো নীরবতার অভিযাত্রী! আল্লাহর নামে এগিয়ে চল।

প্রিয় শাইখের সাহচর্য
শাইখ আমাদের আকাশের নক্ষত্র। আলোর মিনার। পূর্ণিমার চাঁদ। আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। হৃদয়গুলি তাঁর দিকে উন্মুখ। কাঁধের সারি তাঁকে দেখতে কত উদ্গ্রীব! আমাদের হৃদয়ে ছড়িয়ে দেন আলোর বিকিরণ; মুঠোমুঠো রোদের ঝলক! আমাদেরকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন নবুওয়াতী শিক্ষার কথা; সাহাবাদের চেতনাসৌরভ আর সালাফদের সোনালি ইতিহাস।

কিন্তু শাইখের কাছে গমনপথ বেশ বন্ধুর। তাঁর কাছে যাওয়া যেন দুধারী তলোয়ার। তাঁর সঙ্গলাভ মোটেও নিরাপদ নয়। তাঁর বেষ্টনীতে দিনাতিপাতের পরিণাম অজানা।
স্পর্শকাতর বেষ্টনীর আশেপাশে ঘোর ঘোর করলে তাতে পতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ ছিলেন বিশাল সাগর। চিরপ্রবহমান ঝরনাধারা। উচ্ছল জলপ্রপাত। জ্ঞান-শিষ্টাচারের বিস্তীর্ণ সরোবর। যত তাঁর নিকটে যাবেন, ততই তাঁর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। যতই তাঁর সাথে ঘনিষ্ট হবেন, ততই তাঁর প্রতি আপনার মুগ্ধতা বাড়বে। তাঁর মজলিসে মোটেও বিরক্ত হবেন না। যতক্ষণই বসবেন, আপনার পিপাসা নিবারিত হবে না। যতবারই আপনি

তাঁকে অতিক্রম করবেন, তাঁর প্রতি মোহাবিষ্ট হবেন। পাগল প্রেমিকের ন্যায় তাঁর দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছে করবে।

আমি তাঁর আগমন-প্রস্থানে সঙ্গী ছিলাম। ঘুমে-জাগরণে পাশে ছিলাম। একই গুহায় আমরা ঘুমিয়েছি। একই দস্তারখানে আমার আহার করেছি। একই সওয়ারিতে আমরা চলাফেরা করেছি। শাইখ রহিমাহুল্লাহ ছিলেন অনন্য-অসাধারণ ব্যক্তিত্বের। সাহসিকতার অপমান হয় এমন কোনো কিছু তাঁকে করতে দেখিনি। মানবতা লঙ্ঘিত হয় এমন কোনো কিছু করতে দেখিনি, তাঁর সব কথায়; সব কাজে। এমনকি তাঁর মেসওয়াক করার মাঝেও।

অনুপম শিষ্টাচার, অপূর্ব ব্যবহার, অনন্য পৌরুষ, সুমিষ্ট কথন, মধুর ভ্রাতৃত্ব, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ইত্যাদি তাঁর গুণাবলি। শাইখ রহিমাহুল্লাহ ছিলেন শিক্ষা নেওয়ার মতো একটি বিদ্যালয়। পদাঙ্ক অনুসরণ করার মতো এক আদর্শ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকনির্দেশনা তাঁর মাঝে একাকার। তাঁর নিকটবর্তী হওয়া মানে সালাফে সালেহীনের চেতনার নিকটবর্তী হওয়া। তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকার অর্থ হলো- উত্তম চরিত্রের ফুলবাগানে বসবাস করা। নাহ! কখনো আমি তাঁর মর্যাদার যথাযথ চিত্রায়ন করতে পারব না। তাই তো তিনিই আমাদের নেতা; আমাদের আদর্শ। তিনিই আমাদের

পথের দিশা দেওয়ার আলোর নিশানা। আল্লাহর পথের পথিকদের পথে আলো ছড়ানো তারকা।

নদীর অপর প্রান্তে আছে বিরোধীরা। তাদের বিরোধিতায় শাইখের সৌন্দর্য আরও প্রোজ্জল হয়। তাঁর নাম শুনে ধুলোয় উড়ে যায় অশ্বারোহীর দল। বক্তৃতা-কলামের সয়লাব হয়ে যায় পুরো পৃথিবী। মানুষের হৃদয়ে তাঁর সম্মান গেড়ে বসে। তাঁকে বসায় মনের সিংহাসনে। তাঁকে বানায় জীবনাদর্শ। অনেক বড়রাও তাঁর আশেপাশে ছিলেন। তাঁরা যখন তাঁর নিকটবর্তী হন, তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকেন, তাঁর সাথে মেলামেশা করেন, তাঁর মাঝে খুঁজে পান শিশুসুলভ আচরণ; বাচ্চা ছেলের মতো গুরুত্বপ্রদান, ছোটদের মতো কর্মকাণ্ড। তখন তাঁর বড়ত্বের কথা আপনি ভুলেই যাবেন। তিনি যে আপনার আদর্শ সেকথা মুছে যাবে মন থেকে। আমীরের ভয় আর বাকি থাকবে না।

তুমি ব্যথা পাও, ঘটনার আকস্মিকতায় অবশ হয় তোমার দেহ, আতঙ্ক তোমার মাঝে জেঁকে বসে, পার্থক্য সুস্পষ্ট, কথা আর কাজে। মনকে নিয়ন্ত্রণ কর। শিরায়-উপশিরায় আঘাত কর। তাঁকে পড়ার ও শোনার প্রাণন্তকর প্রয়াস চালাও। যতই দুর্যোগ আসুক না কেন। তাঁর ছোট ছোট কাজগুলির ছায়া যখন তুমি পাবে, তখন পৃথিবীর অন্য কারো মুখে এমন জাদুময়ী কথা শুনতে পাবে না। কারো কথা

তোমাকে এত মোহাবিষ্ট করবে না। নিভে যাবে অন্য সব আলো।

সুবহানাল্লাহ! তিনি (আল্লাহ) রিযিক যেমন বন্টন করে দিয়েছেন, তেমনি চরিত্রও বন্টন করে দিয়েছেন। কোনো এক সালাফ বলেছেন, কোনো বান্দা যদি কোনো রহস্য লুকিয়ে রাখেন, আল্লাহ তাআলা তার মুখের দীপ্তি ও কথার আবহে তা প্রকাশ করে দেন।

ওহে প্রিয় শাইখ! আপনি কি ফিরে আসবেন, নাকি চরিত্রের ওপর অভ্যাসের জয় হবে? মানুষ যখন আপনার কাছে আসত, আপনার চিন্তার গভীরতায় তলিয়ে যেত। যখন তিক্ত সত্যকে ছুঁড়ে দিতেন; আলকাম ফলের মতো তিক্ত, তখন তারা আপনাকে ছেড়ে চলে যেত। যখন আপনি তাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন, তখন আপনার জন্য কান্না করার কেউ থাকবে না।

ইতি
আবু হুজাইফা আস-সুদানী

বিষণ্ণতার গল্প
পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী শহর মিরান শাহ। আমরা রণাঙ্গনে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সেসময় আমরা অল্প বয়সী ছিলাম। সরাইখানায় শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তাঁকে পেয়ে আমরা যারপরনাই আনন্দিত ছিলাম। তিনি ছিলেন আমাদের পিতার মতো। কতোই না উত্তম পিতা তিনি! আমরা তাঁর চারপাশে জড়ো হলাম। তাঁর সামনে ছিল সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এর আফরাহুর রূহ পুস্তিকাটি। তাঁর কভারে শাইখ আযযাম রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন একজন শহীদের জীবনকাহিনী। আল-জিহাদ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য। যেমনটি তিনি

করে থাকেন নিয়মিত। শাইখ আযযাম রহিমাহুল্লাহ সেই পুস্তিকাটির সম্পর্কে আলোচনা করলেন; তুলে ধরলেন এর তাৎপর্য। তারপর আমাদের সল্প বয়স দেখে স্নেহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মা-বাবার জন্য মন কাঁদে না?

আমরা বললাম, জি।

তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি বাড়ি যেতে চায়, তাঁর বাড়ি পৌঁছতে কত সময় লাগবে?

বললাম, কয়েকদিন লাগবে! তবে পুরো সপ্তাহও লেগে যেতে পারে।

তিনি বললেন, তোমরা এখন রণাঙ্গনে প্রবেশের প্রস্ততি নিচ্ছ। সুতরাং শাহাদাতের তামান্না কর। তোমাদের কেউ যখন শাহাদাত বরণ করবে, তখন দুনিয়ার জীবন তাঁকে ছেড়ে যাবে। যোহর কিংবা আসরের নামাজের মতোই। তারপর সে তাঁর পরিবারকে দেখতে পাবে। বাড়ির দিকে রওয়ানা হলে কিন্তু এত দ্রুত দেখতে পেত না।

আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, হে শাইখুল জিহাদ! কত উত্তম অভিভাবক ছিলেন আপনি!

শাইখের সাথে যদি আপনি ওঠাবসা করেন, আপনার অন্তরে জিহাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। শাহাদাতের অনুরাগ গজিয়ে ওঠবে মনের মাঝে। যারা এ পথে অটল অবিচল থাকতে চান, তারা যেন শাইখের বক্তৃতা ও রচনার সরোবরে ডুব দেন। তিনি সত্যিই জিহাদের মহানায়ক

ছিলেন। গর্জনকারী সিংহ ছিলেন। সুউচ্চ পাহাড় ছিলেন।

কবিতা

তোমার জন্য তিরস্কৃত হওয়াতে আমি স্বাদ পাই
তোমার মধুর স্মরণে আমি ভালোবাসা কুড়াই। ভালোবাসা পেতে যত তিরস্কারই সইতে হয়
এ পাগলপারা প্রেমিকের কোনো আপত্তি নাই।

সত্যপথের সিংহরা
মুজাহিদীনের এই বিশাল জামাত, এই রক্ত টগবগ তরুণদল; যাঁরা হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে চলেন, নিতান্ত অপরিচিত। নিষ্কলুষ চরিত্র তাঁদের। রণাঙ্গনে ছড়িয়ে আছেন শতদলে। সীমান্তে কিংবা সম্মুখযুদ্ধে। সব ধরনের অনর্থক কথা থেকে তাঁরা নীরব থাকেন। সমালোচনা থেকে তাঁরা দূরে থাকেন। ঝগড়া- বিবাদে ডুবে থাকেন না। মূলকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তরাধিকারে অবিচল থাকেন। সব মুজাহিদই নিঃশব্দ। আল্লাহ- ভীরু। পূত-পবিত্র। শান্ত।

বড় রহস্যময় মানুষ তাঁরা। তাঁদের প্রতি অভিযোগের আঙ্গুল তোলতে পারে না কেউ। পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত কথাবার্তা। আল্লাহর বান্দাদের গীবত করেন না। হৃদয় তাঁদের পাখির মতো। মুমিনদের প্রতি কত সদয় ও দয়াবান! বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাতে আবার মধুরতার প্রলেপ ছড়ানো। নিবৃতে স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে মগ্ন হন। স্বীয় আমীরের উত্তম আনুগত্য করেন। সহযোদ্ধাদের প্রতি কোমল। মুক্ত হস্তে দান করেন। ফাসাদ থেকে বিরত থাকেন। গুনাহ থেকে চোখ সংযত রাখেন। বাতিল থেকে দূরে থাকেন। কুরআনে কারীমের ওপর সর্বদা ঝুঁকে থাকেন। বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দেন আল্লাহর পথে প্রহরারত

হয়ে এবং তাহাজ্জুদ পড়ে। দিনের রৌদ্রপ্রহরগুলি কাটিয়ে দেন খেদমত ও রোজা রেখে। এ যাত্রায় এরাই আস-সাওয়াদুল আজম বা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভয়সংকুল আঁধার পথেই তাঁরা পা মাড়ান।

তাঁদের প্রাসাদ তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পান। গন্তব্যে পৌঁছতে তাঁরা প্রয়াস চালিয়ে যান। যখন পথে ক্লান্ত হন, তখন প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করেন। চলার প্রেরণা আসে। নির্দিষ্ট সময়ে অভিবাদিত হন। সারা বিশ্বের সকল সম্প্রদায়, দল ও জামাত থেকে নির্বাচিত। আলোর ঝলমল বাতি। হিদায়াতের দীপ্ত শিখা। তাঁরা যখন উপস্থিত হন, কেউ গুরুত্ব দেয় না। হারিয়ে গেলেও কেউ খুঁজে না। কেউ আঙ্গুল তোলে না তাঁদের প্রতি। তাঁদের উত্তরাধিকার কম। তাঁদের জন্য বিলাপকারী খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তোমাদের অসহায়দের কারণেই তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হও। রিষিকপ্রাপ্ত হও।
তাঁদের নিষ্ঠা, সালাত ও দুআর কারণে।

[illegible]

[illegible]

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا

‘[illegible]’

[illegible]-

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ

‘[illegible]’

এই হাদীসটি পড়ে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করুন। ভাবুন। চিন্তা করুন। গবেষণা করুন৷ এর শিক্ষাগুলি বের করে আনুন। এরপরও কি কেউ রণভূমি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারে? এরপরও কি আমরা আখিরাতের ওপর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিতে পারি? এরপরও কি আমরা জিহাদ থেকে বিরত থাকতে পারি?

আল্লাহ যাদের জাগরণ অপছন্দ করেন, দূরে সরিয়ে রেখেছেন তা থেকে এবং বলা হয়েছে, বিরত থাকাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, তাদের দলে আমরা অন্তর্ভূক্ত হতে ভয় পাই। আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় আযাব হলো- আনুগত্য করার তাওফীক না হওয়া। হাসান বাসরী রহিমাহুল্লাহ এর কাছে এসে একজন জিজ্ঞেস করল, কিয়ামুল লাইল আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। আমি আর পারছি না! জবাবে তিনি বললেন, হে আমার ভাতিজা! আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। অনুতপ্ত হও। এটি মন্দের লক্ষণ। তিনি বলতেন, কেউ যখন গুনাহে লিপ্ত হয়, তারা কিয়ামুল লাইল থেকে মাহরুম হয়ে যায়। (অর্থাৎ বান্দা গুনাহে লিপ্ত থাকলে কিয়ামূল লাইলের মতো নফল ইবাদত থেকে মাহরূম হয়ে পড়ে। তাহলে কেমন গুরুতর গুনাহে ডুবে থাকলে ফরয বিধান যেমন, জিহাদ ত্যাগকারী হয়ে থাকে?)

জান্নাতী এক ভাইয়ের সাথে

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে থাকে অনেক ভালো বন্ধু; উত্তম সাথি। তারা আমাদের কাছের মানুষ। আমরা তাদেরকে ভাই হিসেবে নির্বাচিত করি। তারা আমাদের সাথে পাড়ি দেয় জীবনের পথ। শেয়ার করে সুখ-দুখের কথা। জিহাদের কাফেলায়। কেউ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন, কেউ অপেক্ষায় আছেন। তাঁরা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা বাস্তবে রূপ দান করেছেন। তাতে কোনো পরিবর্তন করেননি। বিকৃত করেননি। নত হননি। নিকৃষ্ট হননি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের একদলকে শাহাদাত দান করেছেন। হৃদয়ে তাঁদের কল্পনা এলেই আবেগ-উদ্দীপনায় সিক্ত হই। মনে পড়ে যায় সোনালি অতীত। বন্ধুত্বের দিনগুলি। সান্নিধ্যের সময়গুলি। ডর-ভয়ে কেঁপে ওঠে হৃদয়রাজ্য। পৃথিবীটা ভারী মনে হয়। সেসব সোনালি দিনগুলোতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

আমার চক্ষু শীতলকারী বন্ধু আবু আহমাদ আল কুয়েতি, যিনি শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ এর সাথে অ্যাবোটাবাদে শাহাদাতবরণ করেন। মিডিয়ায় যাঁকে বিন লাদেনের প্রেসসচিব বলা হয়েছে। তাঁর সাথে আমার খুবই ঘনিষ্ট

সম্পর্ক ছিল; অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। আমি জেলে চলে এলাম। তাঁর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে কেটে যায় দশটি বছর সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে চলি। কিন্ত মনকে প্রবোধ দেওয়ার মতো কোনো খবর পাই না। হঠাৎ একদিন, শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ এর শাহাদাতের দিন তাঁর নামও দেখলাম। আমি তখন রিয়াদের কেন্দ্রীয় কারাগারে মামলার শুনানির জন্য বন্দী। এর মাসখানেক পর আমাদেরকে জেদ্দার জাহবান কারাগারে মামলার চূড়ান্ত রায়ের জন্য পাঠানো হয়।

সেখানেই, আমার ব্যক্তিগত সেলে স্বপ্নে আবু আহমাদের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি একটি চেয়ারে বসা ছিলেন। চমৎকার অবয়বে। হৃদয় জুড়ানো অনুপম পোশাক জড়িয়ে। আমি তাঁর পাশে মাটিতে বসা ছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আহমাদ! আপনি কি পৃথিবীতে, নাকি জান্নাতে? তিনি বললেন, আমি জান্নাতে এখনই আপনার সাথে সাক্ষাত করতে জান্নাত থেকে এলাম।

আল্লাহ আপনাকে রহম করুন হে আবু আহমাদ! আপনার শাহাদাতকে তিনি কবুল করুন।

কবিতা

কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদি; অশ্রু ঝরাই অবিরত

তাই তো আমার বন্ধুর কাছে আমি নিত্য তিরস্কৃত
সে বলে, তোমার দেখা সব কবরেই কি তুমি কাঁদ? কবর মানে তো বক্র-বন্ধুর পথের মাঝে শুয়ে পড়া
আমি বলি, দুশ্চিন্তা টেনে আনে দুশ্চিন্তাই
সবকটাকে আমি (আমার বন্ধু) মালেক এর কবরই ভাবতে চাই।

ভালোবাসার পঙক্তিমালা

রাসূলগণের অনুসারী তাঁরা।

হিরাক্লিয়াস আবু সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিল, নেতৃত্বস্থানীয় লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, নাকি দুর্বলরা? আবু সুফইয়ান উত্তরে বলে, বরং দুর্বলরাই। হিরাক্রিয়াস বলেন, এরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়।

হুম! দুর্বলরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়। বাহানা দিতে জানে না তাঁরা। নশ্বর পৃথিবীর তাবৎ ভোগসামন্ত্রীকে তাঁরা তুচ্ছজ্ঞান করে। যশ-খ্যাতি, ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে মনে করে নিকৃষ্ট-ইতর। দুনিয়ার ভোগবিলাসে ডুবে থাকাদের দলভুক্ত নয় তাঁরা। ইসলামের বীরসেনানী। ইসলামের সামরিক শক্তি। ধৈর্যশীল। সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী। সওয়াবপ্রত্যাশী। ধুলোয় ধূসর আলুথালু মাথার চুল।

তাঁরা অসহায় দুর্বল। সবাই তাঁদের তাড়িয়ে দেয়। চোখ ফিরিয়ে নেয় তাঁদের দেখলে। কেউই পাত্তা দেয় না। অপরিচিত-যাযাবর। পরিবার ও দেশ ত্যাগ করেছে। ত্যাগ করেছে শৈশবের মাঠঘাট। তাঁরাই নিভৃতচারীর দল। সব কল্যাণকর কাজে জড়িত। আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছেন অনুপম সব চরিত্র।

স্থিরতা তাদের ভূষণ। কল্যাণকামিতা তাঁদের নিদর্শন। আল্লাহভীতিতে পূর্ণ তাঁদের হৃদয়মন। প্রজ্ঞাপূর্ণ তাঁদের প্রতিটি উচ্চারণ। সততা ও ওয়াদাপালন তাঁদের স্বভাবজাত। ক্ষমা ও সদাচার তাঁদের বৈশিষ্ট্য। হক্বই তাঁদের শরীয়াত। হিদায়াতই তাঁদের আলোর মিনার। একত্ববাদী। বিশ্বাসী। প্রভুর পবিত্রতা, প্রশংসা, গুণকীর্তন ও একত্ববাদ বয়ান করে চলে। রক্তের প্রতিটি কণা উৎসর্গিত।
কুরআনে কারীম থাকে তাঁদের বুকপকেটে।

রাতের সন্ন্যাসী। দিনের সিংহশার্দুল।
আল্লাহর রাহে লড়াই করে সারিবদ্ধ হয়ে; কুচকাওয়াজে আন্দোলিত হয়ে। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বেরিয়ে পড়ে।
নীরবে ত্যাগ করে প্রিয় মাতৃভূমি।
আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করে। শাহাদাতকে হন্য হয়ে খুঁজে বেড়ায়। এরাই আস-সাওয়াদুল আজম। নিভৃতচারীর দল।

শাহাদাতের পূর্বে এক শহীদের সাথে

কারো রিযিক ও সময় ফুরিয়ে না এলে সে কখনো মরে না। মৃত্যু কখনও নির্দিষ্ট সময়ের আগপিছ করে না।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا

'আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না ; সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। '

গার্দিজ বিজয়ের আগে যখন আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব চলছিল , তখন আমাদের প্রথম ফ্রন্টে একটি পরিখা খনন করি। যা শত্রুসীমা থেকে অন্তত ১২০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত। খননের পর পরিখার দেয়ালে পানি দেখা দিল। আমরা তা রেখে আরেকটি খননের ইচ্ছা করলাম। আমার মনে পড়ল, আমাদের পিছনের ক্যাম্পে এক আলজেরিয়ান প্রাণিবিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার ভাই আছেন। তিনি রবঈ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাছে স্থানটি পরিদর্শনের প্রত্যাশা করলাম। তিনি এলেন। আমিও তাঁর সাথে পরিখায় নামলাম। তিনি পর্যবেক্ষণ করে আমাকে বললেন, শুধু শুধু কষ্ট করবেন না। এগুলো এখানকার মাটি থেকে চুঁইয়ে পড়া ঘাম। এখানকার সব মাটি থেকেই এমন পানি বের হবে। এরপর আমরা দ্বিতীয় ফ্রন্টে এলাম। রবঈ অজু করে চাশতের নামাজ পড়লেন। এরপর

দু’জনেই বের হলাম। কথা বলতে বলতে হাঁটছিলাম। শত্রুর কাছে রকেটলাঞ্চার ছিল৷ গোলাবর্ষণের শব্দ শুনলাম। তিনি আমার পাশেই ছিলেন। বললেন, মনে হচ্ছে- গোলাটি নিকটেই। আমি বললাম- না, দূরে। কথাটি শেষ না করতেই গোলাটি আমাদের পাশে পড়ল। সাথে সাথেই আমি হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। আমাদের চারিদিকে ধুলো ওড়তে লাগল। ওড়তে লাগল বিক্ষিপ্ত বারুদকণা। তখন আমি ওঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম, একটি গোলা রবঈর চোয়াল ভেদ করে অপরদিকে বেরিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন৷ (আমীন)

তিনি উত্তম ভাইদের অন্যতম ছিলেন। কোমলাচার, প্রিয় ও ভদ্র ছিলেন। এর আগে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে, জিবরাইল আলাইহিসসালাম একটি সবুজ উদ্যানে হাঁটছেন। তিনি নিজেও সেখানে জিবরাইল আলাইহিসসালাম এর পিছু পিছু হাঁটছেন। জিবরাইল আলাইহিসসালাম জমিনে পা রেখে যখন তোলেন, তখন রবঈ সেই স্থানে পা রাখেন। তিনি গার্দিজের প্রথম শহীদ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুস্থলের পাশেই তাঁকে সমাহিত করি আমরা। আমাদের অগ্রবর্তী ক্যাম্প, যেখানে শহীদ হয়েছেন, তাঁর নামেই নামকরণ করি। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন এবং তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন। (আমিন)

অভ্রলেহী আলোর মিনার

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ছিলেন সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট। দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজ সাবলিলভাবে উপস্থাপন করতেন। তাঁর কথাগুলি হৃদয় থেকে উৎসারিত। তাই তা হদয় ছুঁয়ে যায়। আন্দোলিত হয় দেহমন। দেহ থেকে বেরিয়ে যায় সংশয়ের বিষবাম্প।
আপনি পৌঁছে যান উর্ধ্বজগতে; তাতে অনেকদূর চক্কর দেন। তখন আপনি ওপর থেকে দেখতে পারেন। হক্বকে জানতে পারেন।

সাদা’র প্রশিক্ষণ শিবিরে শাইখ এলেন। এবারই প্রথম সরাসরি তাঁকে দেখলাম। যুবকরা তাঁর চারপাশে জড়ো হলো। তিনি সালাম দিলেন। সবার সাথে মোআনাকা করলেন। ঠিক পিতার মতো সবাইকে বুকের সাথে মিলিয়ে নিলেন এরপরের দিন আমাদের ফিকহী দরস ছিল। শাইখ রহিমাহুল্লাহ তায়াম্মুম সম্পর্কে আলোচনা করলেন। মাটি না পায়, তখন সে স্বীয় পোশাকে তায়াম্মুম করবে। এরপর শাইখ স্বীয় হস্তদ্বয় বুকের ওপর মারলেন। পুরো পোশাকে ধুলো ওড়লো। তখন আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। মনের অজান্তেই চিৎকার করে বললাম- আল্লাহু আকবার!

হুম! ইবনুল মোবারক রহিমাহুল্লাহ যথার্থ বলেছেন। তিনি বলেন, সৌরভের মোহময়তা

তোমাদের জন্য। আর আমরা, আমাদের সৌরভ হলো তরবারির রক্তআবর্জনা ও রণাঙ্গনের ধুলোবালি। আমি তখন জিহাদের ময়দানে নবীন ছিলাম। হারামাইনের দেশ থেকে সদ্য এসেছি। যে দেশ কস্তুরি, সুগন্ধি, পারফিউম ও আতরের ভাণ্ডার। আমি মনকে বললাম, এই মানুষটিকেই তো তুমি হন্য হয়ে খুঁজছিলে, তাই না? ইনিই তো সেই আল্লাহওয়ালা আলেম, যিনি কথাকে কাজে পরিণত করে দেখান।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ এর প্রতিটি নিঃশ্বাসই ব্যয় করেছেন জিহাদের জন্য। আজীবন জিহাদের কাজই করেছেন। মরণও হয়েছে জিহাদের জন্য। তাঁর কথাগুলি আজ সত্যবাদী নিভৃতচারী মুজাহিদ জামাতের আলোকবর্তিকা। তারা তাঁর নির্দেশনার ওপরই পরিচালিত। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন হে জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রাণপুরুষ!

দরদমাখা কিছু কথা
আল্লাহর রাস্তা থেকে কিছু ভাই ঝরে পড়েন, যেমনটি শীতের মৌসুমে ঝরে পড়ে গাছের পাতা। রণাঙ্গনের এক মুজাহিদ ভাই পিছুটান ধরেন। অস্ত্রত্যাগ করেন। মাটি আঁকড়ে ধরেন। দুনিয়ার ভোগবিলাসে ফিরে যান। কারাগারের অন্ধকার কুঠরি থেকে বাঁচতে নিজের আখিরাত বিক্রি করে দেন। ভেঙে পড়া বন্দী ভাইদের কথা স্বীকার করে নেন। কষ্টের আগুন তাকে জালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। রণ সওয়ারে আরোহণ করেন না। গন্তব্য থেকে সরে যান। এটি মানবিক দুর্বলতা; যা সব মানুষকেই পেয়ে বসে। যখন বুঝেন, তখন তারা অধৈর্য হয়ে পড়েন। পতনের জন্য আফসোস করেন। সৃষ্টি হয় ভিতরের দহন। দাঁতে দাঁত কামড়ান। ভয়ঙ্কর কষ্ট পান। ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েন। নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। স্বীয়কর্মের প্রতি ঘৃণা জন্মে। যখনই নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে পড়ে, দুর্বল হয়ে পড়েন। দূর থেকে আমাদের দিকে তাকান। ভগ্ন হৃদয়। অশ্রসজল চোখ। কম্পমান হাত। আমাদের চোখে খুঁজে ফেরেন দয়া ও ক্ষমা। আমাদের মুখে অনুসন্ধান করেন এক চিলতে হাসি। আমাদের হাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জানান সাহায্যের আকুতি। তার ও স্রষ্টার মাঝে কেউ প্রতিবন্ধক হতে পারেন না। তাওবা থেকে তাকে রুখে দেওয়ার অধিকার

কারো নেই। হাদীসে এসেছে , তোমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে শয়তানের সহায়তাকারী হয়ো না। আমরা শয়তানকে লজ্জিত করি। ভাইটিকে তাওবা করতে সাহায্য করি। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের তাওবায় খুশি হন। তাওবাকারীকে তিনি ভালোবাসেন।

তোমার ভাইয়ের স্খলন ক্ষমা -সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ। আল্লাহও তোমাকে ক্ষমা করবেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে , যে কোনো মুসলমানকে ক্ষমা করবে , আল্লাহও তাকে ক্ষমা করবেন। সূরা ইউসুফে আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানদের চাইতে অধিক মেহেরবান। ’

অনুপম চরিত্র ছিল তাঁর

শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ এর মতো এত সজ্জন, প্রশস্ত-হৃদয়, উঁচুমানের স্বাপ্নিক ও মার্জিত কথক আমি জীবনে দেখিনি। কোনো ভাইকে কটুবাক্য করতে কখনো শুনিনি। অথচ তখন তাঁর কত বিরোধী ও সমালোচক ছিল।

একদিন আমাদের সাথে সকালের খাবারে কোনো এক মুজাহিদগ্রুপের কিছু মেহমান উপস্থিত ছিলেন। খাবারগ্রহণের পর শাইখ আমাকে বললেন, এই লোকগুলো আমাদের অনেক সমালোচনা করেছে। ব্যাস এটুকুই! আর একটি শব্দও বাড়ালেন না। তিনি সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করতেন না তিনি। তাই তো সিংহপুরুষ। আসলে বড়রা বিদ্বেষপোষণ করতে জানেন না। পরবর্তীতে ভাইটি আমাদের সাথি হয়েছিলেন। স্বীয় দল থেকে পদত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন আল-কায়েদায়। বাইয়াত দিয়েছিলেন শাইখের হাতে। পরবর্তীতে তিনি আল-কায়েদার হাতে গোনা কয়েকজন নেতার অন্যতমে পরিণত হয়েছেন।

শাইখ যেমনি উম্মাহর নেতা ছিলেন, তেমনি সাধারণ মানুষেরও নেতা ছিলেন। তরুণদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। খুবই স্নেহ করতেন তাদেরকে। সব খবরাখবর রাখতেন। যখনই তাদের

সাথে বসতেন, মতবিনিময় করতেন। রসিকতা করতেন। তাঁর বিনয়, আখলাক ও অনুপম শিষ্টাচারের কারণে তিনি আপনার চোখে বড় হয়ে ওঠবেন।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ কারো সমালোচনায় যেমন বিরক্ত হতেন না, তেমনি কারো পরামর্শে অসন্তষ্টও হতেন না। বরং তিনি সমস্যা নিরূপণে আগ্রহী ছিলেন। সবচেয়ে কার্যকরী সমাধানটি তিনি অনুসন্ধান করতেন। একবার তানজীমের ব্যাপারে ৪০ পৃষ্ঠার একটি পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট তাঁর কাছে পেশ করি। নাম দিয়েছিলাম, ‘তলোয়ারের ধারে ভরসা’। এতে তিনি খুবই চমকিত হয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ আমরা তাঁর সাথে বসলাম। অনেক তর্কবিতর্ক হলো। তিনি মোটেও রাগান্বিত হননি। কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাননি। যেমনটি দেখান নিজেদেরকে আহামরি ভাবা নেতারা। শাইখ রহিমাহুল্লাহ সদা আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন। তিনি ছিলেন ধীর-স্থির মেজাজের। যা বলতেন সবই ধৈর্যর সীমার ভিতর থেকে করতেন।

প্রশংসা, সুনাম ও গুণকীর্তন তাকে বিব্রত করত। ব্যক্তি উসামা আমাদের পূজনীয় ছিলেন না; বরং আমরা তো নির্দিষ্ট একটি ইস্যুতে তাঁর সাথে সম্পর্কিত ছিলাম। একবার এক বিয়ে অনুষ্ঠানে তরুণরা একটি সঙ্গীত পরিবেশন করতে দাঁড়াল। তারা কিছুটা সীমালঙ্ঘন করে শাইখের নাম উচ্চারণ করে

বসল। সঙ্গীত পরিবেশন শেষে শাইখ রহিমাহুল্লাহ তাদের সাথে কথা বললেন। খুব বিনয় ও আদবের সাথে। এমনটি করতে নিষেধ করলেন এবং আর কোনো দিন না করার অনুরোধ করলেন।

হুম! আল্লাহর কসম! ঘুটঘুটে আঁধার রাতে তিনি যেন পূর্ণিমা চাঁদ।

শেষ চিঠি

আবু আসিম আত-তাবুকী ওরফে সাঈদ আল-কাহতানী। তিনি চেচনিয়ার উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য যাত্রা করলেন। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। আমার কাছে তিনি তাঁর জীবনের শেষ চিঠিটি লিখলেন। চিঠির শেষে এই পঙক্তিগুলি যোগ করেন।

কবিতা

তাদেরকে বিদায় জানাতে যখন আমরা বের হই হাউমাউ করে কাঁদে তারা; আমরাও অশ্রু ঝরাই। বিরহের সুরা হাতে আমাদের চারপাশে ঘোরে তারা;
হায় হায়! কী হৃদয়বিদারক দৃশ্য! আমরা বিস্মিত হই।
তারা ফিরে যায়; পিছু নেই তাদের আমরা অশ্রুরাও
তারা ডুব দেয় চিৎকার করে; আমরাও দহনে কাতরাই।

এ চিঠি পৌঁছার কয়েক মাস যেতে না যেতেই তাঁর শাহাদাতের খবর এল। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন এবং শহীদ হিসেবে তাঁকে কবুল করুন।

আফগান জিহাদে তিনি অংশ নেন। সতেরো বছর বয়সে। আল্লাহ তাঁকে রিবাত ও কিতাল করার তাওফীক দান করেছেন। খোস্ত, গার্দিজ ও কাবুল বিজয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তারপর তিনি হারামাইনের দেশে ফিরে আসেন। তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে লেখাপড়ায় ফিরে আসার অনুরোধ করলেন। তিনি উচ্চ মাধ্যমিক স্তর সম্পন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। জামিয়াতুল বেতরিল ওয়াল মাআদিন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি জিহাদের স্বাদ পেয়েছেন, তিনি কি আর ঘরে বসে থাকতে পারেন? বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করলেন। হিজরত করলেন চেচনিয়ায়। ওগো তাবুকের বাজপাখি! (আমরা তাঁকে এ নামেই ডাকতাম) আপনার বিরহে আমরা নিজেদের জন্য কেঁদেছি। বিদায় হে আবু আসিম! বিদায়! আল্লাহ আপনার শাহাদাত কবুল করুন।

এক শহীদের কবরে
খোস্ত বিজয়ের পর আফগান মুজাহিদগণ পাকতিয়া প্রদেশের রাজধানী গার্দিজ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। জালালুদ্দীন হক্কানী রহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে। আরবের দু’জন শাইখের নেতৃত্বে আরবের আনসার মুজাহিদ ভাইগণও ছিলেন তাঁদের সাথে। তাঁদের আমীর ছিলেন আবুল হারিস আল-উর্দনী এবং সেনাপতি ছিলেন আবু মুআজ খোস্তী আল-ফিলিস্তিনী।

সেখানে সাতিকান্ড পাহাড়ের ওপর আরব আনসার ভাইগণ তাঁদের প্রথম তাঁবু গাড়েন। ৩৩০০ মিটার উচুতে। সেই তাঁবু থেকে, সেই সুউচ্চ পাহাড় থেকে, পাইন গাছে ঢাকা সেই পাহাড়ের বিস্তৃত পাদদেশ থেকে অনুসন্ধানের রাস্তাসমূহ দৃশ্যমান ছিল। দেখা যাচ্ছিল অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপনের ছক, অনুগামী ঘাঁটির ম্যাপ, কামান দাগানোর স্থান, রসদ সরবরাহকেন্দ্র, রণহাসপাতাল ও এমটি বুথ।

আরব মুজাহিদগণের মধ্যে মিশরের আল-জামাআতুল ইসলামিয়াহ’র কিছু তরুণ ছিলেন। তাঁদের তিনজন গার্দিজ শহরের পূর্বে সৈয়দ করম গ্রামে একটি কাজে গেলেন। তাঁরা হলেন-হুজাইফা, হামজাহ, তৃতীয় জনের নামটি ভুলে গেছি। ফেরার পথে তাঁরা এক বিশ্বাসঘাতকের কবলে পড়েন। হামজাহ ও হুজাইফা শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তাঁদেরকে কবুল করুন। তৃতীয় জন ফিরে আসেন। আনসার আরব ভাইগণ গিয়ে তাঁদের দু’জনের লাশ উদ্ধার করলেন। এরপর তাঁদেরকে পিছনের ঘাঁটিতে দাফন করা হলো। পরে সেখানে মুজাহিদনেতা আবু বানান আল-জাযায়েরী শহীদ রহিমাহুল্লাহ কেও দাফন করা হলো। তিনি খালদুন বিগ্রেডের আমীর ছিলেন। তাঁর অধীনে দু’শর মতো মুজাহিদ ছিলেন। তাদের অন্যতম হলেন শাইখ লিব্বী রহিমাহুল্লাহ এর সাহেবজাদা ও শাইখ আবু জুবাইদা আল-ফিলিস্তিনী। আল্লাহ তাঁর মুক্তি তরান্বিত করুন।

কেন্দ্রীয় গোরস্তানটি প্রথম ফন্টে ছিল। যেখানে রবঈ ইবনে আমির আল-জাযায়েরী রহিমাহুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন। তার পাশে শুয়ে আছেন বিশের অধিক আরব আনসার ভাই। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন। অপরদিকে পিছনের ঘাঁটিতে ছিল শুধু তিনটি কবর। তাঁরা হলেন আবু বানান আল-জাযায়েরী, হুজাইফা আল-মিসরী ও হামজাহ আল-মিসরী রহিমাহুল্লাহ। আল্লাহ তাঁদেরকেও কবুল করুন। এই ঘাঁটিটি পরে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং মুজাহিদীনের সংখ্যা কমে এক সময় খালি হয়ে গিয়েছিল।

এক আরব আনসার ভাই একটি কবরের ভাঙন ও এর এক পাশ ভেঙে পড়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি খবরটি সেনাপতি আবু মুআজ আল-খোস্তীকে জানালেন। আবু মুআজ আমি অধমকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেন। আমার সাথে ছিলেন আরও চারজন যোগ্য ভাই। তাঁরা হলেন আবু মুসআব আশ-শামরানী রহিমাহুল্লাহ, হায়দারাহ আত-তাবুকী রহিমাহুল্লাহ, আব্দুল মাজীদ আল-মিসরী ও মাসউদী আল-জাযায়েরী৷ কবরটি আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করার আদেশ দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে বলা হয়।

আমরা পাঁচজন সেই তিন কবরের পাশে গেলাম। বিধ্বস্ত কবরটি আবু বানান আল-জাযায়েরীর ছিল না। কিন্ত আমরা কবরটি চিহিত করতে পারছিলাম না যে, এটি কি হুজাইফা আল-মিসরীর কবর, নাকি তার সাথী হামজাহ আল-মিসরীর কবর?

আমরা কবরটি খনন করার সিদ্ধান্ত নিলাম।
তারপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
আমরা ধীরে ধীরে কোদাল দিয়ে খনন করতে লাগলাম। এক মিটার গভীরে যাওয়ার পর আমরা কোদাল বাদ দিয়ে হাতে খনন করতে লাগলাম।
খুব ধীরে; ভয়ে ভয়ে। কী ঘটছে তা নিয়ে আমরা শঙ্কিত ছিলাম। কী হচ্ছে তা দেখার অপেক্ষায় ছিলাম।

আমি মাথার দিকে খনন করছিলাম। ধীরে ধীরে। অল্প অল্প। আস্তে আস্তে। আল্লাহু আকবার! মৃতদেহ দৃশ্যমান হলো। মাটি ঢেকে নিয়েছিল পুরো শরীরকে। সুবহানাল্লাহ! তিনিই, হ্যাঁ, তিনিই। তিনি হামজাহ আল-মিসরী রহিমাহুল্লাহ৷ মনে হচ্ছে যে, আজই তাঁকে দাফন করা হলো। খুব শান্তিতে আরাম করছেন। পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে প্রশান্তির ঘুম দিচ্ছেন। ক্ষমা করবেন হে বীরসেনানী! আমরা আপনাকে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি। আল্লাহর রহমত ও বরকত আপনাদের প্রতি বর্ধিত হোক। তাঁর চেহারা, চুল ও দাড়ি থেকে আমি মাটিগুলি সরিয়ে নিলাম। তাঁর হাতের আঙ্গুল নাড়ালাম। কোমল-নরম। নখগুলি লম্বা। তিনি তেমনই ছিলেন যেমনটি আগে ছিলেন। সেই সবুজ সামরিক উর্দি গায়ে জড়ানো ছিল। সেই আফগানী পাঞ্জাবীও ছিল। ছিল তার ওপর শুকনো রক্তদাগ।

কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি। তখন আমরা তাঁকে কবর থেকে বের করে আনার সিদ্ধান্ত

নিলাম। কবরটি মেরামত করলাম। তারপর প্রিয়ভাইকে সেখানে ফিরিয়ে দিলাম। আবার বিদায় জানালাম। দাফন করলাম দ্বিতীয় বারের ন্যায়। দেখে নিলাম শেষবারের মতো। আমরা তাঁর শাহাদাত ও এই পুনরায় বের করার সময়টুকু হিসেব করলাম। দশ মাস বা তার চেয়ে কিছু বেশি দিন হবে। হে হামজাহ! আল্লাহ আপনাকে রহম করুন এবং আপনার শাহাদাতকে কবুল করুন৷ (আমীন)

কথায় কথা আসে। আমরা আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর লাশগুলিকে দেখতাম যে, এক দু’দিনের চেয়ে বেশি স্বাভাবিক থাকত না। লাশ গলে যেত। পচে যেত। মিশে যেত মাটির সাথে। কালো রক্ত প্রবাহিত হত। পোকা বের হত। বের হতো উৎ্কট গন্ধ। কেউ কাছে ভিড়তে পারত না। আল্লাহর নেয়ামতরাজির জন্য তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে এ পথে কায়েম রাখেন। আমাদেরকে শাহাদাহ দান করেন। পশ্চাদপসরণকারী নয়; তিনি যেন আমাদেরকে অগ্রগামী হিসেবেই কবুল করেন। (আমীন!)

*****

কঠিন মুসীবতের সস্মুখীন তুমি। কষ্টের মাত্রা ক্রমাগত বেড়েহ চলছে। আপাতদৃষ্টিতে তোমার কাছে মনে হবে, এ বুঝি- নিঃশেষ হয়ে পড়ার অবস্থা! জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার উপক্রম! কিন্তু না, হে পথিক! তুমি ভেঙে পড়ো না। মনোবল হারিয়ে ফেলো

না। বস্তুত বিপদাপদ ও মুসীবতে আক্রান্ত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধাদা ও কল্যাণ দান করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহাহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে মুসীবতে আক্রান্ত করেন।' -সহীহ বুখারী : ৫৬৪৫

তাই হে পথিক! তোমার ওপর আপতিত সকল মুসীবতকে কল্যাণ মনে কর। ধৈর্যধারণ কর সব ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে, সর্বদা অটল-অবিচল থাক সত্যপথে ...

কঠিন মুসীবতের সম্মুখীন তুমি। কষ্টের মাত্রা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। আপাতদৃষ্টিতে তোমার কাছে মনে হবে, এ বুঝি– নিঃশেষ হয়ে পড়ার অবস্থা! জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার উপক্রম! কিন্তু না, হে পথিক! তুমি ভেঙে পড়ো না। মনোবল হারিয়ে ফেলো না। বস্তুত বিপদাপদ ও মুসীবতে আক্রান্ত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের মর্যাদা ও কল্যাণ দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

“আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে মুসীবতে আক্রান্ত করেন।” -সহীহ বুখারী: ৫৬৪৫

তাই হে পথিক! তোমার ওপর আপতিত সকল মুসীবতকে কল্যাণ মনে কর। ধৈর্যধারণ কর সব ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে, সর্বদা অটল-অবিচল থাক সত্যপথে....

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

এখন আমরা পুরো মৃতদেহের সামনে। সবকিছু দেখা যাচ্ছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ। গলেনি।